One Million Copy Project

From the bestselling author of Bangladesh

লতিফুল ইসলাম শিবলী

আসমান

যে গল্প জীবনের চেয়েও বড়

প্রজ্ঞাবিন্দু

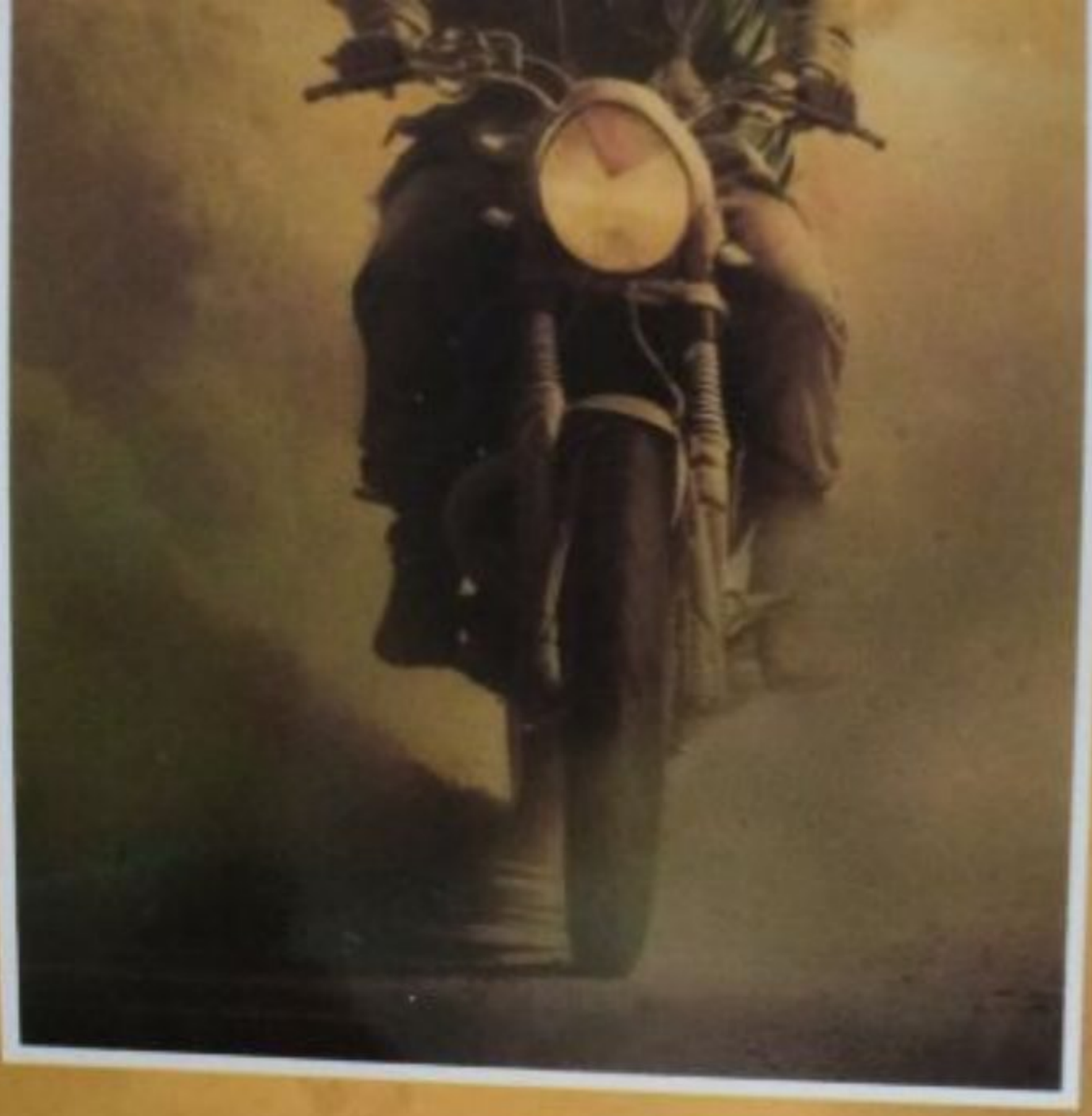

আমেরিকার কুখ্যাত কারাগার গুয়ানতানামো বে থেকে বিনা বিচারে ১২ বছর জেল খেটে মুক্তি পেয়েছে এক বাংলাদেশি।

ওয়াশিংটন পোস্টের এই খবরে চমকে গেছে বাংলাদেশ।

পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সাফ জানিয়ে দিয়েছে এমন সন্ত্রাসীর দায়িত্ব নেবে না বাংলাদেশ।

আমেরিকান আর্মির কার্গো প্লেন তাকে ফেলে গেছে আলবেনিয়ার তিরানা বিমান বন্দরে। ট্রাভেল ডকুমেন্টহীন, দেশহীন মানুষটাকে পৃথিবীর কোনো দেশ রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় না। রিফিউজির স্ট্যাটাস নিয়ে তাকে থাকতে হবে রেডক্রসের শেল্টারে।

মানুষটা এখন কোথায় যাবে?

চেনা সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, একটা অচেনা দরজা খুলে যায়। জীবন বন্দি হয়ে গেলে, সেটা জীবনকেও ছাপিয়ে যায়। সেই জীবনের গল্প জীবনের চেয়েও বড় হয়ে যায়...

The Fiction Based on Fact

এই উপন্যাসের স্থান সত্য, কাল সত্য, ইতিহাস সত্য, কাল্পনিক শুধু এর চরিত্রগুলো।

আসমান

লতিফুল ইসলাম শিবলী

উ ৎ স র্গ

লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে—
'আপনি কে?'
আমি উত্তর দেই,
'আমি দুই খলিফার বাবা।'

প্রাণপ্রিয় দুই পুত্র
ওমার
এবং
ওসমান

One Million Copy Project

From the bestselling author of Bangladesh

লতিফুল ইসলাম শিবলী

আসমান

যে গল্প জীবনের চেয়েও বড়

প্রতীক

'হৃদয় আল্লাহর ঘর। মানুষের হৃদয়টা তৈরি করা হয়েছে এই জন্য যে সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ থাকবেন। সে ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু ঢুকালেই শুরু হবে তোমার জাগতিক অশান্তি।'

ধানমন্ডি আট নম্বর রোডের জামে মসজিদের বৃদ্ধ পেশ ইমাম মাওলানা ইসহাক আব্দুর রহমান কথাগুলো বললেন ধীরস্থির আর অনুচ্চ শব্দে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আছরের আজান হবে, তিনি প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। তাঁর নজর একটি আরবি কিতাবের দিকে। মাথার ওপরে ঘুরছে পুরাতন ফ্যান। সেই ফ্যানের বাতাসে সাদা কাশফুলের মতো তিরতির করে কাঁপছে তার দীর্ঘ দাড়ি। সেপ্টেম্বরের শেষ দুপুর, প্রায় নীরব ধানমন্ডির রাস্তা দিয়ে বিক্ষিপ্ত বেল বাজিয়ে চলে যাচ্ছে একটা রিকশা। এরপর গুমোট নীরবতা, যেটা ধীরে ধীরে অস্থির করে তুলল ওমার রিজওয়ানকে। শুধুমাত্র নীরবতাটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য ওমার প্রশ্ন করল—

'আমার মনে অশান্তি আপনি কীভাবে বুঝলেন?'

এই প্রশ্নে বৃদ্ধ ইমামের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা সস্নেহে হাসির দ্যুতি।

'বেশ কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে মসজিদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখছি— কিন্তু তোমাকে জামাতের নামাজে দেখি না।'

'আর তাতেই আপনার মনে হলো আমার মনে অশান্তি?'

এই বেপরোয়া তরুণটির সাথে কথা বলতে কেমন যেন ভালো লাগছে ইমাম সাহেবের। তরুণটি তাকে একবারও হুজুর সম্বোধন করেনি। তাই একটু মজার ছলে বললেন—

'তিন ধরনের লোক মসজিদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। ফকির, জুতা চোর আর মজনু। তুমি হলে মজনু শ্রেণির লোক।'

এই ইমাম লোকটির মধ্যে পিরালী কিংবা বুজুর্গি দেখানোর কোনো প্রচেষ্টা নেই, কথা বলছেন খুব সাধারণ কিন্তু বিচক্ষণ মানুষের মতো। ইমামের গাম্ভীর্য থেকে বের হয়ে এসেছেন। ওমার রিজওয়ানের সেটা পছন্দ হয়েছে। ইমাম সাহেবের এই রুমটার মধ্যে একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ। গন্ধটা যেন হঠাৎ করেই তার নাকে এসে লাগল। ধানমন্ডি লেকের তীর ঘেঁষে প্রচুর গাছপালা আর তার মাঝে এই মসজিদটা। ইমাম সাহেবের রুমটা মেহরাবের সাথে লাগানো কিন্তু মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনটি বড় বড় কাঠের আলমারি ভর্তি বই, একটি সুন্দর করে গোছানো বিছানা তার পাশে

অফিসের মতো করে সাজানো চেয়ার-টেবিল। দর্শনার্থীরা আসলে সামনের চেয়ারে বসে। সাধারণত ইমামদের রুম এমন হয় না। ওমার ইমামের মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে। ইমাম ইসহাক আব্দুর রহমান ওমারের দিক থেকে নজর সরিয়ে তার ডান দিকের জানালা দিয়ে দৃষ্টি দিলেন বাইরের দিকে। বিশাল জানালার ওপারে গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে লেকের জলে ঝকঝক করছে রৌদ্রোজ্জ্বল ক্ষয়িষ্ণু দুপুর। সেদিকে তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এই সুযোগে ওমার ইমাম সাহেবকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ইমাম খুব সযত্নে একটা দীর্ঘশ্বাস লুকানোর চেষ্টা করলেন। ওমার সেটা ধরে ফেলেছে। এই দুপুরের নির্জনতাকে আর বেশি প্রশ্রয় না দিয়ে সে প্রশ্ন করল—

'বলুন তো কি কারণে আমাকে আপনার মজনু শ্রেণির লোক বলে মনে হলো?'

জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই নুরানী হাসিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইমামের চেহারা। মাথা ঘুরিয়ে সস্নেহে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল তাকে, তারপর বলল—

'মজনুদের চুল থাকে উশকোখুশকো লম্বা, চোখের নিচে কালি থাকে আর পোশাক থাকে ছেঁড়া।'

ইমাম সাহেবকে ভুল প্রমাণ করার জন্য একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে ওমার বলে—

'এখনকার ফ্যাশন হচ্ছে লম্বা চুল আর ছেঁড়া জিন্স। এর মধ্যে মজনু আসে কী ভাবে?'

মোয়াজ্জিন মসজিদের মাইকে গুনে গুনে তিনটি টোকা দিল, একটা ফুঁ দিল আর গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

এক্ষুনি আছরের আজান হবে।

ইমাম সাহেব কথা শেষ করার জন্য বললেন— 'যুগে যুগে সব মজনুদের একই হাল, বিচ্ছেদ-বেদনা লুকিয়ে রাখা কঠিন।'

প্রায় নির্জন ধানমন্ডিকে সরব করে হেঁকে উঠল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ— আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর।

আজান শেষ হলে ইমাম ইসহাক চেয়ারের পাশে রাখা ছড়িটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে একটা রুবাইয়াত আওড়ালেন—

সসীমকে ভালোবেসে করেছ পূজা
ভালোবেসে হয়ে গেছ দাস
তোমার অনন্ত মন আর কারো নয়
এক অসীম প্রভুর নিবাস।

ওমার স্থির হয়ে চেয়ারে বসে আছে। ইমাম সাহেব তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন— 'ওজু করে জামাতে আসো।' স্বশব্দে চেয়ারটা পেছনে সরিয়ে ওমার উঠে দাঁড়াল, বলল, 'নেশা অবস্থায় কি নামাজ পড়া যায়?' এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ইমাম বললেন— 'নেশাই তো আমাকে মসজিদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

মসজিদ বরাবর সোজা লেকের পশ্চিম প্রান্তের বটগাছটা এখন শৈশব কৈশর পেরিয়ে তারুণ্যে পড়েছে। বটগাছগুলো বহু বছর বাঁচে। কোনো কোনোটি দুই-তিন শতাব্দী। মানুষের প্রাচীন ছাতা। একই বৃক্ষের ছায়ার নিচে বেড়ে ওঠে তিন-চার প্রজন্মের মানুষ। যে শিশু এই বটবৃক্ষের ছায়ার নিচে খেলতে খেলতে বড় হয়, সে-ই একদিন আরেক শিশুর জন্ম দিয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়, তারপর একদিন মরে যায়। বৃক্ষদের ভেতর বটবৃক্ষ সবচেয়ে দুঃখী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের জীবন মানুষের মতো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর ডালপালার ভেতর থেকে নেমে আসে ঝুরি, ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে আর ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে এর প্রথম মূলটি। দীর্ঘ জীবন মানেই শোকের দীর্ঘ সফর।

উথাল-পাথাল বাতাসে লেকের ধারে এই পড়ন্ত দুপুরে বটগাছের ছায়ার নিচে বসে জীবনে প্রথমবারের মতো যেন বটগাছের দিকে তাকিয়ে আছে ওমার। পাতায় পাতায় লেগে তরুণ গাছটির গা থেকে বৃষ্টির মতো একটা আওয়াজ বের হচ্ছে। ধানমন্ডিতে বড় হয়ে ওঠা ওমারের এই জায়গাটা অনেক প্রিয়। ধানমন্ডি বয়েজে পড়া পুরো স্কুল জীবন কেটেছে এখানে, এরপর ঢাকা কলেজ, সেখান থেকে এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকোনোমিক্সে দ্বিতীয় বর্ষ চলছে, আর নিয়মমতোই চলছে তাদের এখানকার আড্ডাটা। বটগাছটার দিকে এত মনোযোগ দিয়ে কখনই তাকায়নি ওমার। ওর বন্ধুরা এখানে আসা শুরু করে সন্ধ্যার পর থেকে, সারা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওরা আসতে থাকে। আড্ডা চলে রাত এগারোটা পর্যন্ত। ইদানীং এদিকটায় নাকি ক্রাইম বেড়ে গেছে। ধানমন্ডি থানার সেকেন্ড অফিসার কাওসার নিয়মিত আসে। এগারোটার দিকে, এসে ওদের আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন উঠে যেতে হয়। পড়ন্ত দুপুরে ইমামের রুম থেকে বের হয়ে হঠাৎ করে ওমারের মনে হলো এই মুহূর্তে এই শহরের কোথাও ওর যাওয়ার জায়গা নেই।

বুকের ভেতর ঝড়ের অস্থির তাণ্ডব অথচ শান্ত দিঘির স্থিরতা নিয়ে বটগাছের নিচে বসে বসে ওমার তার ভাবনাগুলো নিয়ে ভাবছে। এটা কি ফেন্সিডিলের ঘোর! কাশির সিরাপ খেয়ে এমন নেশা হতে পারে ওমার কখনো ভাবতে পারেনি। দ্য উইন্ডো ব্যান্ডের লিড গিটারিস্ট বন্ধু রুশোর কথায় ওর প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। শান্তিনগর কাঁচাবাজারের ভেতরে সাতসকালে ঢুকে সেদিনের প্রথম কাস্টমার ছিল সে আর রুশো। কাশির সিরাপের পরিচিত স্বাদ আর গন্ধ, একটু একটু করে আধা বোতল

খেয়ে ফেলেছিল, তাতেও কোনো নেশার ফিলিংস আসেনি। মুচকি মুচকি শয়তানি হাসি দিয়ে রুশো বলেছিল— 'ধরবে মামা, ওয়েট, আর একটা কোর্স বাকি আছে।' এরপর তাকে নিয়ে গেল মগবাজার মোড়ের তাজ রেস্টুরেন্টে। ওয়েটারকে চা-এর অর্ডার দিয়ে চোখ টিপে দিল। কিছুক্ষণ পর দুই কাপ চা আর তার সাথে এলো এক কাপ ভর্তি চিনি। কয়েক চুমুকে কাপ থেকে চা কমিয়ে সেখানে প্রতি কাপে ছয়-সাত চামচ চিনি মিশিয়ে কাপটা এগিয়ে দিল ওমারের দিকে। সেই চা খাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল। চোখ-কান-মুখ জুড়ে নেমে এসেছিল জমাট স্তব্ধতা আর মনের মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব।

'পিনিকটা আরও ভালোমতো ধরার জন্য আর একটা কোর্স বাকি আছে, চল।'

এরপর তিরিশ টাকা ঘণ্টা চুক্তিতে ওরা একটা রিকশা ভাড়া করেছিল। তাজ রেষ্টুরেন্টের সামনে সব সময় কিছু মুখচেনা স্পেশাল রিকশাওয়ালা খুব আয়েসি ভঙ্গিতে বসে থাকে, বিশেষ ধরনের কাস্টমার ধরার জন্য। রিকশা ছুটল তুফান গতিতে। চোখে মুখে যত বাতাস লাগে পিনিক ততই বাড়তে থাকে। মগবাজার থেকে ধানমন্ডি শংকর রায়ের বাজার ছাড়িয়ে রিক্সাওয়ালা ওদের নিয়ে গেছে বুড়িগঙ্গার তীরে। এরপর থেকে ওমার রুশোর সাথে মিলে পিনিক নেওয়া শুরু করল, সেটা শুধুমাত্র ফেন্সিডিলের কারণে না, বরং খাওয়ার পরের ধাপগুলোর কারণে বেশি আকর্ষণ করেছে। রুশো ফেন্সিডিল খাওয়াকে একটা ক্লাসিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। গত দুই মাস ধরে ওমার রুশোর সাথে থাকে। সারারাত রুশো তার নতুন কেনা আইবানেজ ইলেকট্রিক গিটার নিয়ে পাগলামো করে আর সেই পাগলামো মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওমার উপভোগ করে। এই দুই মাসে ওদের দুই পরিবার জেনে গেছে রুশোর বাড়ি ওমারের সেকেন্ড হোম একইভাবে ওমারের বাড়ি রুশোর সেকেন্ড হোম। অসাধারণ গিটার বাজায় রুশো, নিজের বেডরুমটাকে সাউন্ড প্রুফ প্র্যাক্টিস প্যাড বানিয়ে নিয়েছে। রুশো ওমারের ঢাকা কলেজের সহপাঠি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর রুশো ঘোষণা দিয়েছে সে আর পড়বে না। পড়বে না তো পড়বেই না, তাকে আর কোনোভাবেই পড়াশোনায় ফেরানো যায়নি। সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার বাবা শেষ পর্যন্ত তাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। রুশোর বাবা পুরাতন ঢাকার বিশাল অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িপাতিল ব্যবসায়ী। কিছু দিন নিয়মিত সুবোধ বালকের মতো গদিতে বসেছে। গদিতে বসেই দ্রুত শিখে নিয়েছে কীভাবে ক্যাশিয়ারের চোখ ফাঁকি দিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে একটা-দুইটা বড় নোট লুকিয়ে ফেলতে হয়। রুশোর সেই টাকায় চলে তার বন্ধুদের একুশ জনের গ্রুপ। স্কুলে থাকতেই শিখে ফেলেছিল গিটার। সেটা এখন তার ধ্যান-জ্ঞান-নেশা। তার ধারণা জীম মরিসনের ভেতরে যে রেড ইন্ডিয়ানের আত্মা ছিল সেটা মরিসনের মৃত্যুর পর এখন তার ওপরে ভর করেছে। রুশো জীম মরিসনকে আক্ষরিক অর্থে পূজা করে। জীমের ব্যান্ড ডোরস-এর

অনুসরণে ফর্ম করেছে সাইক্যাডেলিক রক ব্যান্ড দ্য উইন্ডো। রুশোর ড্রাগ এডিকশন মূলত জীম মরিসনের লাইফ স্টাইলের অন্ধ অনুকরণের ফল। এতদিন শুধু গাঁজা খেত, এখন গাঁজার পাশাপাশি শুরু করেছে নতুন ড্রাগ ফেন্সিডিল। ওমার ধূঁয়া টানতে পারে না, তাই গাঁজায় তার আকর্ষণ নেই। সারারাত রুশো জীম মরিসনের লাইট মাই ফায়ার, ওয়েটিং ফর দ্য সান আর তার কবিতা এন আমেরিকান প্রেয়ার গেয়ে-বাজিয়ে ওমারকে মুগ্ধ করে রাখে। সকাল হওয়ার সাথে সাথে ছোটে শান্তিনগরের কাঁচাবাজারে। দেড়শ টাকায় এক বোতলের হাফ হাফ তারপর তাজ রেস্টুরেন্টের চিনি-চা তারপর দীর্ঘ রিকশা ভ্রমণ দিয়ে বুড়িগঙ্গা। এই চক্র ওমারকে তার অস্থিরতার ভিতরে একটা সাময়িক আরাম দিচ্ছে।

ওমার নিঃসঙ্গতাকে ভয় পায়, ভয় পায় নির্জনতা। 'একাকিত্ব' ওকে একা পেলেই নৃশংস গোপন সৈন্যবাহিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। শত শত তীক্ষ্ণ ছুরি যেন ওকে চিরতে থাকে, টেনে নিয়ে যায় পানির অতলে, আর সে দম নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে ভেসে উঠতে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো তার এমন কষ্টের অনুভূতি হচ্ছে। আজ প্রায় দুই মাস পর সে একা হয়ে গেল। এই সময় তার রুশোর সাথে থাকার কথা ছিল, কিন্তু রুশো আজ গদিতে গেছে। রুশোকে এখন আর নিয়মিত গদিতে যেতে হয় না। যে ছেলে সারারাত জাগে আর সারাদিন ঘুমায় সে কীভাবে সময় মেনে অফিস করবে। অনিয়মিত হতে হতে এখন সেটাই নিয়ম হয়ে গেছে। রুশোর বাবাও তার এই বখাটে ছেলেটার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গেলেই শুধু রুশো এখন গদিতে বসতে যায়। ক্যাশিয়ারের সাথে ইতোমধ্যে তার একটা গোপন সিস্টেম তৈরি হয়ে গেছে। ওমারের জীবনের এই কঠিন দুঃসময়ে রুশো যেন একটা আশীর্বাদ। রুশোকে বেশিক্ষণ সহ্য করা কঠিন। সবার চোখে সে বড়লোকের বখাটে আর নষ্ট ছেলে। এগ্রেসিভ আর বস হয়ে থাকতে পছন্দ করে। দেদারছে টাকা ওড়াতে পারে বলে তাকে এড়ানো মুসকিল। ঘুরেফিরে রুশোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় ওদের বন্ধুত্বের সৌরজগৎ।

এত দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও ওমার রুশোকে বুঝতে পেরেছে। রুশো ফুল অফ হার্ট। ওর সাথে নিঃস্বার্থ আর গভীরভাবে না মিশলে ওকে কেউ বুঝবে না। এই দুই মাসে ওরা পরস্পরকে বুঝে ফেলেছে। ওমারকে রুশো খুব গোপনে সমিহ করে। ওমার অন্য সবার মতো না। একাডেমিক পড়ার বাইরে ওর প্রচুর পড়াশোনা রয়েছে। স্পেশালি ষাট আর সত্তর দশকের পাশ্চাত্যের কালচারাল রেভুলেশন, কাউন্টার কালচার, হিপ্পি মুভমেন্ট আর রক অ্যান্ড রোলের উত্থান বিবর্তন নিয়ে রয়েছে প্রগাঢ় আর স্বচ্ছ ধারণা। দুজনই পছন্দ করে সাইক্যাডেলিক আর প্রোগ্রেসিভ রক মিউজিক। যদিও রুশো যেভাবে জীম মরিসন পছন্দ করে ওমার সেভাবে করে না। ওমারের ধারণা জীম যতটা না পপুলার তার শিল্পে তার চেয়ে বেশি পপুলার তার উশৃঙ্খল

জীবনাচারে। সেই প্রথম রকস্টার যাকে উশৃঙ্খলার জন্য স্টেজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আর সেই সময়টাও ছিল শিল্পের পাশাপাশি বাড়তি কিছু দেখানোর। এসবে রুশোর রয়েছে প্রবল মত বিরোধ। তার মতে শিল্পির জীবনও কখনো কখনো শিল্প হয়ে ওঠে, মরিসনের সাতাশ বছরের জীবনটাও তেমন ছিল। মিউজিকের চাইতে বেশি রুশো তার নিজের জীবনটাকে শিল্পে পরিণত করতে চায়। ওমার রুশোর এই ভুলটা ধরতে পারে, কিন্তু তাকে ঠিক শোধরাতে পারে না, এমনকি সেটার পদ্ধতিও তার জানা নেই। এইসব কিছু মিলিয়েই রুশোকে তার ভালো লাগে। রুশো জানে কী ঘটেছে ওমারের সাথে। রুশো ওমারের এই দুঃসময়টা গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে। এই জগতে পাগল ছাড়া কেউ পাগলামোর কোনো মূল্য দেয় না। রুশোর রাত জাগা সমস্ত পাগলামোর একমাত্র মুগ্ধ দর্শক ওমার। ওমার তার কষ্টগুলো নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে না, রুশো সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। ফেন্সিডিলের নেশা দুজনের মধ্যে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। মাত্রাতিরিক্ত কোডিন ফসফেট রুশোকে করে হাইপার আর ওমারকে করে সাইলেন্ট। সারারাত রুশো অনর্গল কথা বলে, গিটার বাজায়, হঠাৎ চিৎকার করে গেয়ে ওঠে 'ডোরস' থেকে ব্রেক অন থ্রো—

You know the day destroys the night
Night divides the day
Tried to run
Tried to hide
Break on through to the other side...

গাইতে গাইতে জীম মরিসনের মতো অদ্ভুত রহস্যময় অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে থাকে রুশো। যেন ফণা তুলে নাচছে একটা বিষাক্ত সাপ।

আলো-আঁধারির রুমের মধ্যে রুশোকে তখন আজাজিল শয়তানের মতো লাগে। ওমারের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় ওরা পরস্পরকে চিনতে থাকে। ওমারের অবাক মুগ্ধ মুখের দিকে রুশো শকুনের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারে ওমার এখানে নেই। অস্পষ্ট আলোয় ওর ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস রুশোর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।

সন্ধ্যার আঁধার ঘন হওয়ার ঠিক আগে আগে রুশো বটগাছের নিচে এসে হাজির হয়। ওর আসা দেখে বোঝা যায় সে বেশ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

'পিনিক আছে?'

'তুই না থাকলে কি পিনিক থাকে?'

এই উত্তরে রুশো দারুণ খুশি হয়।

'এত দেরি করলি কেন?'

'তোকে একটু একা থাকার প্র্যাক্টিস করালাম,' ওমার বোঝে এসব রুশোর জাস্ট কথার কথা। রুশোর চোখে-মুখে একটা চাপা খুশির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

'আজ ভালো দান মেরেছি, আগামী এক মাস আর গদিতে যেতে হবে না,' বলেই রুশো পকেট থেকে মুঠো ভরে বের করে আনল কতকগুলো পাঁচশ টাকার নোট। নোটের সাথে সাথে বের হয়ে এলো একটা আঙুল সমান লম্বা গাঁজার পুরিয়া। পুরিয়াটা ওমারের হাতে দিয়ে দলাইমলাই হয়ে থাকা নোটগুলো সোজা করে ভাঁজে ভাঁজে পকেটে রেখে দিল। অন্য পকেট থেকে গোল্ডলিফ সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সেটা দুই আঙুল দিয়ে টিপে টিপে নরম করে সেটার ভেতর থেকে তামাকগুলো বের করে ওমারের হাতের তালুতে রাখল। এরপর গাঁজার পুরিয়া থেকে পরিমাণ মতো গাঁজা নিয়ে সেখান থেকে অপ্রয়োজনীয় ডালপালা পরিষ্কার করে বাম হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডলতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে একটা বুনো ভেসজ গন্ধ ওদের নাকে এসে লাগে। মুগ্ধ রুশো হাতটা নাকের কাছে এনে দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে-

'মালটা আসামের, দেখ রংটা এখনও কেমন সবুজ।'

তালুতে গাঁজা ডলতে ডলতে রুশো ওমারের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকে। ভাবলেশহীন ওমার তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। গম্ভীর গলায় রুশো বলে-

'লোনলিনেসটা এনজয় করতে পারিস না?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ওমার বলে 'হ্যাঁ পারি, তুই যদি পাছার কাপড় খুলে একটা গরম রুটি বানানোর তাওয়ার ওপরে দশ সেকেন্ড বসে থাকতে পারিস তা হলে আমিও লোনলিনেস এনজয় করতে পারব।'

ওমারের কথাটা বুঝতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে রুশোর। এবার প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ল রুশো, সেই হাসিতে যোগ দিল ওমার। রুশো চিৎকার করে হাসছে, ওমারও হাসছে সমান তালে। কতদিন পর ওমার হাসছে, হাসতে হাসতে ওর বুকটা খালি হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে ওদেরই সাথে বেড়ে ওঠা বটগাছটার নিচে দুই কিশোর কি এক অজানা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাসছে। তখন হঠাৎ করেই এক ঝটকা পুবালি বাতাস এসে নাড়িয়ে দিয়ে গেল বটগাছটার ঝাঁকড়া সবুজ চুল। যেন বটগাছটাও মাথা দুলিয়ে হাসছে, যেন ওরা দুজন নয়, ওরা এখন তিনজন, ফিরে গেছে ওদের কিশোর বেলায়।

কলাবাগানের ষাট দশকের ওল্ড ফ্যাশন্ড বাড়িগুলো দেখতে অনেকটা স্কুলের মতো মনে হয়। ওমারদের বাড়িটা তেমন। প্রায় আধা বিঘা জমির ওপর তৈরি বাড়িটার পেছনে ঝাড় জঙ্গল আর বিশাল বিশাল মানকচুর গাছ। সেখানে একদল বেজির রাজত্ব। ওমারদের বাড়ির প্রতিদিনের মাছ কোটার পরের কাঁটাকুটা নাড়ীভুড়িগুলো ওদের জন্য সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। বেজির ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নির্দিধায় ঘুরে বেড়ায় সারাবাড়ি। বাড়ির নিচতলাটা ছিল ওমারের বাবার চেম্বার। আইনের মোটা মোটা বই দিয়ে ঠাসা অফিস রুমটা। ওমারের আইনজীবী বাবার মৃত্যুর পর এখন সেটা ড্রয়িংরুমের মতো ব্যবহার করা হয়। ওমাররা চার ভাই। বড় ভাই ব্যাংকের ম্যানেজার, মেজ ভাই ঠিকাদারি ব্যবসার পাশাপাশি তাদের প্রোপার্টিজগুলো দেখাশুনা করে। ওমারের ছোট ভাই মায়ের আদরের ঘরকুনো বালক। সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। পড়াশুনা আর মায়ের আঁচল ধরে সারাদিন বসে থাকাই তার জীবন। এখনও মা মুখে তুলে না খাইয়ে দিলে সে খায় না। বাড়ির মূল গেটের পাশেই একটা বিশাল কড়ই গাছ। যখন কড়ই ফুল ফোটে, একটা হালকা মিষ্টি গন্ধে তাদের সারা বাড়িটা মৌ মৌ করে। সন্ধ্যার আগ দিয়ে মনে হয় সারা শহরের চড়ুই পাখিগুলো চলে আসে এখানে রাতে ঘুমানোর জন্য। শেষ রাত থেকে গাছের দখল নেয় দোয়েল পাখিরা। ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে তাদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। দোয়েলদের প্রথম ডাকটা শুনলেই ওমার বুঝতে পারে এখন তিনটা পঁয়তাল্লিশ বাজে। প্রথম প্রথম ওমার আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করত এই সময়ের এক মিনিটও হেরফের হয় না। এই মহাবিশ্ব জগৎ এক রহস্যময় নিয়মের ঘড়িতে চলছে। দোয়েলগুলো তারই অংশ। এর পরের ঘটনাগুলোও নিয়ম মেনে ঘটছে প্রতিদিন। প্রথম দোয়েলটা ডেকে ওঠার পরপরই, খুট করে দরজা খোলার একটা আওয়াজ হবে।

শিশুদের থপথপ করে হাঁটার মতো করে একটা পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে ওর ঘরের দিকে, আর সেই শব্দ শোনার সাথে সাথে ওমার এক লাফে তার বিছানায় গিয়ে গভীর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। স্কুল ঘরের মতো লম্বা করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেই আওয়াজ এসে থামবে ওমারের মাথার কাছে, তারপর চুলের মধ্যে চিরুনির মতো আঙুল বুলিয়ে আদর করবেন যিনি, তিনি ওমারের মা। তিনি শুধু ওমারের মা'ই নন, এ বাড়ির চড়ুই, বেজি, দোয়েল সবার মা। সারা বাড়ি জুড়ে একটা স্নিগ্ধ মমতা ছড়িয়ে থাকে এই মা'টার জন্য। গভীর রাতে মা

ওঠেন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে, তাহাজ্জুদ শেষ করে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে দোয়া করেন। মৃত আত্মীয়স্বজন, স্বামী-সন্তান, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে সারা পৃথিবীর সমস্ত অসহায় মানুষদের জন্য তিনি দোয়া করেন। ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত চলতে থাকে সে দোয়া। ওমারের মায়ের রুমের জানালার কার্নিসে এসে পায়রাগুলো ডাকাডাকি শুরু করলে তিনি মোনাজাত শেষ করেন। মা জানেন, ওমার সারারাত জেগে থাকে। শেষ রাতের এই অপার্থিব সময়ে ওমার তার মায়ের মুখোমুখি হতে চায় না, তাই মা তার রুমে আসার আগেই সে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকে। মা তার মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন আর দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। এভাবে হাত বুলাতে বুলাতে মসজিদ থেকে ভেসে আসে ফজরের আজান। আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক তখনই ওমার গভীর ঘুমের অতলে হারিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক সেই সময়টায় ওমার তার মায়ের যে কথাটা প্রতিদিন শোনে সেটা হলো— 'ওঠো, ফজরের নামাজটা পড়ে তারপর ঘুমাও।' ওমারের সেটা কখনই পড়া হয় না। মা আর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে ওমারের রুমের লাইট অফ করে চলে যান।

সবকিছু এমন করেই চলছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে এসব আর আগের মতো নেই। মা এসে মাথায় হাত বুলালেও এখন আর তার ঘুম আসে না। একটা ছোট্ট অপরাধবোধ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। মায়ের সাথে করা এই অভিনয়টা তাকে এক ধরনের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এখন আর সে নিয়মিত বাসায় থাকে না, কিন্তু যে দিন থাকে সেই রাতটা তার আরও বেশি কষ্টের মনে হয়। মাঝে মাঝে তার খুব ইচ্ছে করে মাকে তার কষ্টের কথাগুলো বলতে, কিন্তু পারে না। মায়ের হাতের স্পর্শে তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। একটা উথলে ওঠা কান্নাকে সে অনেক কষ্টে চেপে রাখে। না বলতে পারে, না কাঁদতে পারে, না ঘুমের অতলে হারিয়ে যেতে পারে। আজ মা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—

'আমি জানি তুই জেগে আছিস।'

ওমারের বুকটা ধক করে ওঠে, তবুও সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে।

'বৃষ্টির আগে পিঁপড়ারা টের পায়, ঝড় বা ভূমিকম্পের আগে পাখিরা টের পায়, আর যত আড়াল করে যতদূরেই থাকে, সন্তানের কষ্ট মা'রা ঠিকই টের পায়। ইনশাআল্লাহ্ তোর সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' ওমারের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। সেই দীর্ঘশ্বাসটাকে ধীরে ধীরে ছেড়ে ওমার সেটা লুকানোর চেষ্টা করে। ওমার জানে, সে নিজে থেকে না বললে তার মা কখনই তার কাছে জানতে চাইবে না কি তার কষ্ট। অবাধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে ওমার আর তার ভাইয়েরা। মা ছোটবেলা থেকেই বলতেন— 'আমি তোদের ভালো মন্দের শিক্ষা দিয়ে তাকদিরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এখন যা কিছু ঘটবে সবটাই ভালোর জন্য ঘটবে। আমার কাছে

কোনো কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। তোদের জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহ তোদের ভিতরে তৈরি করে দিয়েছেন বিবেক। আমার কাজ তোদের জন্য দোয়া করে যাওয়া।'

এরপর কিছুক্ষণের জন্য মা নীরব হলেন, যা কিছু পাঠ করেছিলেন সেটা একটা দীর্ঘ ফুঁ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন ওমারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তারপর উঠে যাওয়ার আগে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

'তুই কি ইসহাক হুজুরের কাছে গিয়েছিলি?'

চোখ বুজে পড়ে থাকা অবস্থায় ওমার ছোট করে উত্তর দেয়, 'হুঁ'।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মা শীতল কণ্ঠে বললেন—

'দুঃখ-কষ্টের ভার কেউ কারোটা বহন করতে পারে না। সেটা কাঁধে নিয়েই মানুষকে নির্দিষ্ট পথ আর সময় অতিক্রম করতে হয়। সাহসী আর বুদ্ধিমানেরা ধৈর্যের সাথে এই পথ আর সময়টুকু অতিক্রম করে। বোকারা চায় তার সেই ভার অন্য কারো কাঁধে কিছুটা তুলে দিতে। তোরা যেটাকে বলিস শেয়ার করা। মানুষের ভেতরের কষ্টটা অপার্থিব, আত্মিক, আধ্যাত্মিক। আত্মিক শক্তিসম্পূর্ণ কোনো মানুষ যদি তোর সেই কষ্টের সময়টুকুতে তোর বন্ধু বা চলার সাথি হয় তা হলে দেখবি তোর কষ্টের সময় আর পথ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। এর বাইরে দুর্বল অন্তরের বন্ধুরা তোর মনের আগুনে বাড়তি কিছু খড়কুটো তুলে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারে না। এছাড়া আদতে কষ্টের কোনো শেয়ার নেই।'

বাইরে তখন ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে। দোয়েলের উৎপাতে কড়ই গাছের চড়ুইগুলো শোরগোল তুলেছে। বেজির বাচ্চাগুলো সেই শব্দে গর্তের মুখে এসে ঢুলুঢুলু চোখে উঁকি মারছে। আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত মা নিশ্চুপ থাকলেন।

.তারপর বললেন—

'ইসহাক হুজুরের কাছে আবার যাবি, তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবি আমার মা বলেছে আমাকে আপনার বন্ধু করে নিতে।'

ধানমন্ডির ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠে এ বছরের সবচেয়ে বড় কনসার্টটা হচ্ছে। সেখানে মাইন্সস, এলআরবি, ফিলিংস, ওয়ারফেজের পাশাপাশি ওয়ার্ম আপ ব্যান্ড হিসেবে সুযোগ পেয়েছে রুশোর ব্যান্ড ইউন্ডো। রুশোর জন্য চারটি গান গাওয়ার সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কনসার্টটা রুশোর জীবনের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কনসার্ট। এই সুযোগটা করে দিয়েছে রুশোর মামা মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি এলাকার রংবাজ তোতা। আয়োজকদের তোতা সাফ জানিয়ে দিয়েছে রুশোর ব্যান্ডকে নিলে এখানে কনসার্ট হবে নইলে হবে না। তোতাকে নারাজ করে কনসার্ট করার মতো রিস্ক নেয়নি আয়োজকরা। দশটা নতুন ব্যান্ডের তালিকার মধ্যে ছিল রুশোর ব্যান্ড, সেখানে সবাইকে টপকে রুশো চান্স পেয়েছে এটা খুব বেশি কেউ জানেনি। রুশো যখন মঞ্চে ওঠে তখন মাঠ অর্ধেক ভরেছে। লম্বা লাইনে ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীরা ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠে ঢুকছে। মোটামুটি সবার লক্ষ্য পরের ব্যান্ড ওয়ারফেজের কনসার্টটা ধরা। রুশো চারটা নিজের লেখা সুর ও কম্পোজ করা গান রেডি করে রেখেছিল। গানগুলো সাইক্যাডেলিক রক ফর্মে করা। গানের কথাগুলো এতটাই বিমূর্ত যে সেটার অর্থ বুঝতে হলে রীতিমতো গবেষণা করতে হবে। রুশো তার জানপ্রাণ দিয়ে গানগুলো গাইছে কিন্তু মাঠের মধ্যে সেটার বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি গান শেষে কেউ তালিটুকু দিতেও যেন আলসেমি করছে। রুশো ভালো গান গায় গীটার বাজায় ওর সাথের ড্রামার বেজ গীটারিস্ট, কী বোর্ডিস্ট সবাই ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান অথচ গানের ভিতর দিয়ে তারা আবেদন তৈরি করতে পারছে না। রুশোর চেনাজানা আর বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায় শ'খানেক ছেলেমেয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে রুশোকে উৎসাহ দিয়ে চিৎকার করছে, যেটা মাঠের বাকি দর্শকদের বেশ বিরক্ত করছে। রুশোর তৃতীয় গান থেকে দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হেভী মেটাল ফর্মে সে গানটি গাইছে, গানের কোথাও 'রক্তক্ষরণ' শব্দটা আছে বলে, আর সেই শব্দের সময় তাল মাত্রাজনিত একটা ব্রেক আছে বলে বোঝা যায় রুশো একটা বাংলা গান গাইছে।

রুশো হার্ডকোর রকার। সে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের হুবুহু ফিলসফিটা ধারণ করে এবং সেই মিউজিকের ফর্ম ভেঙে লোকাল ফর্ম তৈরি করতে নারাজ। গভীর নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রুশো তার গানগুলো লেখে। নেশা অবস্থায় সেগুলো শুনলে একটা ভাব আসে, কিন্তু নেশাহীন স্বাভাবিক অবস্থায় গানগুলো এতটাই দুর্বোধ্য যে অনেক সময় রুশো নিজেও কোনো কোনো লাইনের অর্থ দাঁড় করাতে পারে না। তখন রুশো

আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে— 'এসব গান শুনতে হলে তোকে ঘোরের ভেতরে ঢুকতে হবে, ঘোর ছাড়া ঘোরা যায় না রে পাগলা। ওমার বোঝে এসব ভুনভাম কথা বলে রুশো সত্য লুকায়। রুশোর ভাষায় তার গান স্পিরিচুয়াল, ভাববাদীদের গান। ভাব আনতে নেশা লাগে। 'লালনের মাজার ছেউরিয়াতে দেখিসনি, লালন সাধকেরা কেমন সিদ্ধি খেয়ে সিদ্ধ হচ্ছে।'

ওমার প্রতিবাদ করে বলেছিল 'লালন কি বলে গেছেন যে গাঁজা খেয়ে তার গান শুনতে হবে, বা চর্চা করতে হবে?'

'হ্যাঁ জীম মরিসনও তো বলেনি যে মারিজুয়ানা বা এলএসডি খেয়ে তার গান শুনতে হবে। কিন্তু তোর কি মনে হয় জীম কখনো নেশা না করে মঞ্চে কোনো গান গেয়েছে? লালন গাঁজা খেয়ে গান করেছে কি না সেটা তো আমরা কেউ দেখিনি। কিন্তু আমরা জীমকে দেখেছি মঞ্চের ওপর প্রকাশ্যে ঢকঢক করে মদ খেতে, নেশায় বেসামাল হয়ে প্যান্টের জিপার খুলতে, এসব কারণে মঞ্চে উঠে পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে। এসবের কারণে জীম পরিতাজ্য হলে কি সে রক আইকন হতে পারত। রোলিং স্টোনের র‍্যাঙ্কিং এ পৃথিবীর সর্বকালের সেরা গায়কদের তালিকায় তার অবস্থান ৪৭ নম্বর। ইনফ্লুয়েন্স না থাকলে তোদের চোখে এমন একজন খারাপ লোক এমনি এমনি এমন অবস্থানে পৌঁছাতে পারে?

শোন, একমাত্র গুরুই জানে কোন তরকারি কী দিয়ে রান্না করতে হয়। কীসের সাথে কি মেশালে স্বাদ হয় অমৃত। আমরা জীম মরিসনের মুরিদরা জীমের ওয়াইল্ড লাইফস্টাইল ফলো করি বলেই জীমের সাইক্যাডেলিক রকের স্বাদ নিতে পারি। সব পরম্পরা, বুঝেছিস; ছেউরিয়াতে যেভাবে গাঁজা খেয়ে লালন চর্চা হয় সেটা লালনের জীবনাচার থেকে তার মুরিদরা গ্রহণ করেছে কি না, কে জানে। আর আমার গান বুঝতে হলে লালন আর জীমের মতো ভাববাদী হতে হবে। সব শিল্পবোধে সবাই পৌঁছাতে পারে না। সবাই যেমন পারে না বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। মরিসনের কালচার ছিল 'কাউন্টার কালচার' একইভাবে এই অঞ্চলে লালনও ছিল একটা কাউন্টার কালচারের প্রবর্তক। লালন ছিল ধর্ম বিশ্বাস আর জাতপাতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলিম-ধর্ম বিশ্বাসের বাইরে সে তৈরি করেছিল একটা নিজস্ব ধর্ম চিন্তা। অনেকে সেটাকে বলে বাউল ধর্ম। লালন নিজেই বলেছেন 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে। লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না তা নজরে।' এখন বুঝেছ মামা, লালন কীভাবে প্রচলিত কালচারকে কাউন্টার মেরেছে। লালনের মুরিদরা সিদ্ধি খায়, আমি মরিসনের মুরিদও সিদ্ধি খাই আর সাইক্যাডেলিক রস আস্বাদন করি। বলা তো যায় না মামা আগামী ২০/২৫ বছর পর আমার মুরিদরাও সিদ্ধি খাবে আর আমার গানের মর্ম উপলব্ধি করবে। আর বলবে আহা গুরু রুশো বর্তমানে বসে লিখেছে ভবিষ্যতের গান, বর্তমানকালের গর্দভরা

বুঝতেই পারেনি কোন উচ্চমার্গে ছিল তাদের গুরু রুশো। তখন ইতিহাসে তোর নাম লেখা থাকবে, তুই ছিলি আমার প্রথম মুরিদ, আমার প্রতি প্রথম ইমানটা তুই এনেছিলি।'

এসব কথা রুশো হালকা মেজাজে বললেও, ওমার জানে রুশো এই সব কথা তার বিশ্বাসের ভেতর থেকে বলে। আর যখন বলে তখন রুশোর ভেতর থেকে যেন অন্য কেউ কথা বলে। একমাত্র ওমারই বুঝে গেছে রুশোর লক্ষ্য শুধুমাত্র গায়ক হওয়া না। তার লক্ষ্য গুরু হওয়া। সে তার গানের ভক্ত তৈরি করতে চায় না, চায় মুরিদ তৈরি করতে। এমন মুরিদ যে তাকে প্রথমে চর্চা করবে, তারপর ধারণ করবে, তারপর তাকে পুজা করবে। ঠিক যেভাবে লালনের হার্ডকোর ভক্তরা বাউল ধর্মের নামে লালনের পূজা করে, ঠিক যেভাবে জীম মরিসনের এন আমেরিকান প্রেয়ারের মতো তার দর্শনকে পূজা করে। রুশো প্রচলিত ধর্ম মানে না, রুশো যখন বলে— 'মিউজিক ইজ মাই রিলিজিওন আর আমি হলাম সেই ধর্মের নতুন গুরু। ওমার তখন তাকে তাচ্ছিল্য করে বলে, 'ফোট্। আমাদের গুরু আজম খান।'

রুশো রেগে গিয়ে বলে 'হাইকোর্টের মাজারে আর মিরপুরের শাহ্ আলীর মাজারে গিয়ে দেখ অশিক্ষিতরা কতশত গুরুর পা ধরে বসে বসে গাঁজা টানছে। ওদের মতো তোরাও জানিস না গুরু কাকে বলে, আর গুরু হওয়ার যোগ্যতা কী?

শোন্ গুরু হতে হলে নিজস্ব দর্শন থাকতে হয়, সেই দর্শনের চর্চা থাকতে হয়। সেটা গানে গানে সুরে সুরে অথবা উপাশনার আকারে উদযাপিত হয়। একজন কথা লিখে দিবে অন্যজন সুর করে দিবে আর গায়ক লম্বা লম্বা চুল রেখে গাঁজা খেয়ে টলতে টলতে মঞ্চে সেই গান ডেলিভারি দিয়ে কয়েক হাজার ভক্তকে মাতিয়ে দিলেই গুরু হওয়া যায় না। গুরু হচ্ছে সে, যে নিজের কথা নিজের সুরে নিজের দর্শন-মতবাদ প্রচার করে। সময়ের সাথে সাথে সেই দর্শনকে ভক্তদের চর্চার ভিতর দিয়ে টিকে থাকতে হয়। এমন গুরু এই অঞ্চলে শুধু একজনই আছে সেটা লালন ফকির। আর পশ্চিমে আছে জীম মরিসন।

কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে গুরু লালনের সমাধিতে যা ঘটে, একই ঘটনা ঘটে প্যারিসের প্যারল্যাসেইজ সিমেট্রিতে মরিসনের সমাধিতে।

আজম খানের সব মিলিয়ে শ'খানেক গান আছে, সেই সব গানের মধ্যে খুব বেশি হলে দশ-পনেরোটা গান তার নিজের লেখা। সেই কয়েকটা গানের ভীতর দিয়ে সে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ স্টাবলিস্ট করতে পারেনি। আজম খানকে আমি বড়জোর বাংলা রকের পাইওনিয়ার বলতে পারি, গুরু না। শোন্ এই দেশে লালনের পর গুরুর আসনটা এখনও শূন্য আছে।' বলেই চোখ টিপে দিল রুশো। নেগেটিভ হলেও রুশোর ভিতরে একটা সম্মোহন ক্ষমতা আছে। ওমার সেই ক্ষমতা টের পেয়েছে। যেটা এখন পর্যন্ত আর কেউ টের পায়নি।

প্রচণ্ড খারাপ মেজাজ নিয়ে রুশো গাঁজা ভরা সিগারেট টানছে। মঞ্চে এখন গান গাইছে ব্যান্ড ফিলিংস। তারা গাইছে গান 'মান্নান মিঞার তিতাস মলম।' পুরো মাঠ ফিলিংস এর সাথে সমস্বরে গাইছে। রুশোকে কেন্দ্র করে ঘেরাও করে ওর বন্ধুরা নাচছে আর গলা মিলাচ্ছে। সবার নজর মঞ্চের দিকে। ওম্যান কমপ্লেক্সের মাঠের শেষ প্রান্তের এদিকটার বাতাস গাঁজার গন্ধে এমন ভারী হয়ে আছে যে, সুস্থ কেউ এখানে এসে দাঁড়ালেই তার নেশা ধরে যাবে। সবাই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ওমারের নজর রুশোর দিকে। ফিলিংসের গানের সাথে উদ্দাম অডিয়েন্সের দিকে ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে আছে রুশো। রুশোর শো-টা আক্ষরিক অর্থেই ফ্লপ হয়েছে। ওয়ার্ম আপ ব্যান্ড হিসেবে নতুন ব্যান্ডগুলো মূলত এই জাতীয় বড় কনসার্টে কাভার সং করে থাকে, কিন্তু রুশো নিজের নাম্বার করতে যেয়ে বোকামি করে ফেলেছে। অডিয়েন্স তার শেষ গানটা আর শুনতে চায়নি, ভুয়া ভুয়া বলে তাকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড অপমানবোধ রাগ আর অত্যাধিক গাঁজা টানার ফলে রুশোর চোখ লাল হয়ে আছে। রুশোকে দেখে ওমারের মায়া লাগছিল। অদ্ভুত! রুশো বন্ধু, ভক্ত আর স্থাবক দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে অথচ কি ভীষণ একা। রুশো ভিড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে শেষ প্রান্তের প্রাচীরের কাছাকাছি চলে এসেছে। বেশ একটা আলো-আঁধারি এখানে। মঞ্চে এখন এলআরবি। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে গোটা মাঠ। এলআরবি গাইছে 'হাসতে দেখ গাইতে দেখ।' রাজ্যের ক্লান্তি ভর করে রুশোর মধ্যে, বসে পড়ে সবুজ ঘাসে। বসার সাথে সাথে আরও ক্লান্তি চেপে ধরে রুশোকে, চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। মাটির পৃথিবীর হাজারো মানুষের ভিড় থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকায় আকাশের দিকে। নিকষ অন্ধকার আকাশ, কোথাও কোনো আলো নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও রুশো কোনো তারা খুঁজে পেল না আকাশে। চোখ বুজে গভীর করে শ্বাস টেনে নেয়। দুই হাতের তালুকে এক করে মাথার নিচে দেয়।

'চল এখান থেকে চলে যাই'

রুশোর একই সমান্তরাল শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওমার।

রুশো জানত কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে ওমার চলে আসবে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে রুশো বলে—

'কোথায় যাবি, সারা শহর জুড়ে গাঁজা পুড়ছে।'

মঞ্চে তখন আইয়ুব বাচ্চুর হাতে গীটারের সলো পার্টটা কাঁদছে। ওমারের কাছে সবকিছুই বড় অর্থহীন মনে হচ্ছে। নিজের কষ্ট ভোলার জন্য ড্রাগস্ আর মিউজিকের ভিতরে ডুবে থাকতে চেয়েছে অথচ সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভেতরের শূন্যতা যেন একটা বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে বাড়ছে আর কষ্টটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। কনসার্টটাকে তার একটা বন্দি কারাগারের মতো মনে হচ্ছে।

সে এখান থেকে বের হতে চায়। আবার রুশো ছাড়া বেরও হতে পারবে না। রুশো যেন নিজেই একটা বিরহের সংগীত, নিজেই ড্রাগস্। তবে কি ওমার সত্যিসত্যি রুশোর মুরিদ হয়ে গেছে। আজ সবকিছুই ওভার ডোজ। দুজন পুরা দুই বোতল ফেন্সিডিল খেয়েছে আর গাঁজা কত স্টিক পুড়েছে সেই হিসাব ওরা জানে না। গুপিবাগের রমা, রুশোর সাথে কী-বোর্ড বাজায়। আজ রমা কাঁটাবনের বস্তির সব মাল মনে হয় একাই কিনে ফেলেছে। আজ ছিল রমার জন্মদিন, তার ওপর এমন গ্র্যান্ড শো।

'চল এই শহর ছেড়েই চলে যাই।'

'কই যাবি?'

'প্রথমে বুড়িগঙ্গায় যাব তারপর নৌকায় চড়ে প্ল্যান করব, কই যাব।'

'ঠিক আছে চল।'

তড়াক করে ওমার উঠে দাঁড়ায়। রুশো ঠিক সেভাবেই পড়ে থাকে। উঠতে চায় কিন্তু পারে না। কেউ যেন তাকে মাটির সাথে পেরেক মেরে আটকে রেখেছে, ওমার হাত বাড়ায় রুশোর দিকে। রুশো হাত ধরে না। একটা গড়ান দিয়ে উপুর হয়, তারপর দুই হাতে ভর দিয়ে হাঁটুর ওপরে বসে, চুলের ব্যান্ডটা খুলে ফেলে, ১২ ইঞ্চি লম্বা চুলের জঙ্গল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেকে দেয় তার মুখমণ্ডল। আলো-আঁধারির মাঝে রুশোকে এখন ভূতগ্রস্ত নারীর মতো মনে হচ্ছে। এরপর হাতের ওপর ব্যালান্স রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রুশো। এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল ওমার রুশোর দিকে। কেন যেন তার মনে হলো রুশোই হবে এই শহরের ভবিষ্যৎ গুরু। ঝট করে ওমারের দৃষ্টিকে ধরে ফেলল রুশো। ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে জিজ্ঞেস করল, 'কী?' ওমার মুচকি হেসে বলল, 'চলো গুরু।'

বলেই এক লাফে ওমার ওম্যান কমপ্লেক্সের প্রাচীরের ওপরে উঠে পড়ে।

ওমারের মুখে 'গুরু' ডাকটা শুনে প্রথমে ধাক্কা খায় রুশো, তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে হাসি। 'গুরু' শব্দটা রুশোর ওপর ম্যাজিকের মতো কাজ করে। ওর যত রাগ-ক্ষোভ-অপমান ছিল সব নাই হয়ে যায়। মানুষ চায় সবাই না হোক অন্তত 'কেউ একজন' তাকে বুঝুক। হাজারো সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষ আসলে সেই কেউ একজনকেই খুঁজে বেড়ায়। এই খোঁজার জার্নিটাই জীবন।

একটা বিশাল পরিচিতির গণ্ডি থেকে ওরা দুজন এখন পালাচ্ছে। মূল গেট দিয়ে বেরোতে গেলে অনেককে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ওরা সেই ঝামেলায় না গিয়ে প্রাচীর টপকে পালাচ্ছে। ওরা ধানমন্ডি গার্লস্ স্কুলের সামনের নীরব রাস্তা ধরে পালাচ্ছে আর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডে মাইলস্ গাইছে 'হ্যালো ঢাকা।' লেকের ধারে পৌঁছেই ওরা পেয়ে গেল একটা বেবিট্যাক্সি। লাফ দিয়ে চড়ে বসেই রুশো বলল— সদরঘাট। বেবিট্যাক্সিওয়ালা গাইগুই করে বলল— 'না মামা অতদূর যাব না।'

ওমার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিল রুশো। রুশোর কিছু চুল পড়ে আছে ওর মুখের ওপর। সেই চুলের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নেশায় ঢুলুঢুলু রুশোর লাল চোখ। সেই দৃষ্টিতে শীতল কণ্ঠে বেবিট্যাক্সিওয়ালার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল— 'চল্'।

কে জানে কী ছিল সেই দৃষ্টিতে, বেবিট্যাক্সিওয়ালা চুপচাপ স্টার্ট দিল। নিয়ন লাইট বদলে সারা শহর জুড়ে সদ্য লাগানো হয়েছে হলদেটে সোডিয়াম লাইট। শহরটাকে এখন কেমন যেন জন্ডিস রুগির মতো মনে হয়। রংটা ওমারের পছন্দ নয়। মালিবাগের মোড় ক্রস করার সময় 'এই থাম থাম' বলে রাস্তার পাশে বেবি থামায়। সেখানে ফুটপাতে কিছু রুটি ভাজির দোকান আছে। মূলত যেসব রিকশাওয়ালা সারারাত রিক্সা চালায় তারাই সস্তায় এখানে খায়। আর খায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে খ্যাপ মেরে বাড়ি ফেরা মিউজিশিয়ানরা, বেইলি রোডের রেকর্ডিং স্টুডিওতে রাতের শিফ্টে কাজ শেষ করে এখানে সস্তা খাবার আর আড্ডার একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে।

রুশো আর ওমারের খাওয়া দেখলে বোঝা যায় গাঁজার খিদে কত ভয়াবহ। বেবিটেক্সিওয়ালাকে নিয়ে ওরা পেটপুরে তৃপ্তি সহকারে খায়। বেবি ড্রাইভার এখন ওদের বুঝে গেছে। প্রায় ওদের বয়সি ড্রাইভারের ভিতরে একটা বাউলা বাউলা ভাব আছে। মধ্যরাতের প্রায় নীরব শহরকে বেবিটেক্সি তার উৎকট ভটভট শব্দে বিরক্ত করতে করতে ছুটছে সদরঘাটের দিকে।

চাঁদপুর আর বরিশালগামী শেষ লঞ্চগুলো চলে গেছে অনেক আগে। একটা অস্বস্থিকর নীরবতা নেমে এসেছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে। ওয়াইজঘাট, জিনজিরা যাওয়ার কয়েকটি খেয়া নৌকা ছাড়া নদীটাও প্রায় শুনশান। অনেক দরকষাকষির পর ৭০ টাকা ঘণ্টায় রাজি হয়েছে একটা খেয়া নৌকার মাঝি। মাঝি মূলত জেলে, মাঝে মাঝে খেয়া ঘাটে ট্রিপ মারে। রুশো আর ওমারকে নিয়ে মাঝি বাবুবাজার বাদামতলীর দিকে বৈঠা মারা শুরু করল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলো।'

রুশোর এই কথায় মাঝি কেমন থতমত খেয়ে যায়। তবুও সাহস করে মাঝি জানতে চায়, 'কেন মামা, অন্ধকারে যাইতে চান কেন, মতলব কী?'

রুশোকে থামিয়ে দিয়ে ওমার বলে—

'তুমি মিঞা মানুষ দেখে বুঝ না, হ্যায় হলো গায়ক, আমাদের গুরু। গুরু আজ গ্রহ-নক্ষত্র, তারকা দেখবেন। শহরের আলোর ভিতরে কি তারাভরা আকাশ দেখা যায়! তুমি ভয় পাইয়ো না, আমাদেরকে ঘুটঘুটা অন্ধকারের ভেতরে নিয়ে চলো। তারপর নদীর মাঝ বরাবর নিয়ে চুপচাপ বইসা থাকবা।'

খেয়া পারাপারের বেশ বড়সড়ো নৌকাটা, পাটাতনের ওপর একটা শিতল পাটি বিছানো। দুই বন্ধু টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। মাথার নিচে হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝি একটা বিড়ি ধরিয়ে বেশ জোরে জোরে বৈঠা মেরে নৌকাটাকে মাঝ নদী বরাবর নিয়ে যায়। মাঝির গন্তব্য গভীর অন্ধকারের দিকে। নৌকা যতই এগোতে থাকে টার্মিনালের শব্দগুলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। ঘণ্টাখানেক চলার পর ঢাকা শহরটাকে দূরের আলেয়ার মতো মনে হয়। আরও ঘণ্টা খানিক চলার পর শহরটাকে আর দেখা যায় না। নদীর দুই পাড়ে নীরব-নিস্তব্ধ, গ্রাম, হাঁট-বাজার আর ফসলের মাঠ। সম্ভবত এটা ঘোর অমাবশ্যা। মাঝি তাদের ঠিক জায়গামতোই নিয়ে এসেছে, তাকে কিছু বলা লাগেনি, মাঝ নদীতে নৌকাটাকে সে স্থির করে রেখেছে। শান্ত বুড়িগঙ্গা। নৌকাটা অদ্ভুত ছন্দে মৃদু মৃদু দুলছে। জমিনের গভীর অন্ধকার উন্মুক্ত করে দিয়েছে অনন্ত অসীম গ্রহ-নক্ষত্রের ভান্ডার। যেন পার্থিব অন্ধকার খুলে দিয়েছে শত শতাব্দীর অতলে লুকিয়ে থাকা অপার্থিব গুপ্তধন। অন্ধকারের এমন সৌন্দর্য ওরা আগে কখনো দেখেনি। মহাশূন্যের এমন ভয়াবহ সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে ওদের নেশা কেটে যায়। অপার বিহ্বলতায় বাকরুদ্ধ। নৌকার গায়ে লেগে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দটুকু যেন আরও গভীর করে তুলছে অন্ধকার কবরের নিস্তব্ধতা। একটা দীর্ঘ নীরবতার পর অস্ফুটে ওমার উচ্চারণ করে—

'ওহ মাই গড, ইটস এমেইজিং।'

তারপর আবার সব চুপচাপ। এই নীরবতা ভাঙার জন্য রুশো বলল—

'বল দেখি, পৃথিবীতে যত মানুষ আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যদি মহাকাশের প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে একজন মানুষের ভাগে কয়টা করে তারা পড়বে?'

রুশো জানে আউটার স্পেস নিয়ে ওমারের ভালো পড়াশোনা আছে। ওমার নিজেও মহাবিশ্বের বিশালতা নিয়ে ভাবছিল, মহাবিশ্বের এই বিশালতার মাঝে কত ক্ষুদ্র এই মানব জীবন। ওমার ভাবছে ক্ষুদ্র এই মানুষের সামনে কেন মেলে ধরা হয়েছে এই বিশালতা। মানুষ যত বেশি বিশালতার জ্ঞান লাভ করছে ততই নিজের ক্ষুদ্রতা টের পাচ্ছে। সসীম মানুষের ব্রেন ধারণ করে অসীমের জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করার পর লোভী মানুষ অসীমকে ছুঁতে চায়, চায় অমরত্ব। ওমারের বুক চিরে বের হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। পাশ থেকে রুশো সেটা শুনতে পায়। ওমারের পায়ে নিজের পা দিয়ে হালকা ধাক্কা দিয়ে আবার জানতে চায়—

'বল না আমার ভাগে কয়টা তারা পড়বে?'

'তোর ভাগে যে কয়টা পড়বে সেই কয়টার হিসাব বুঝে নিতে তোর এই ছোট্ট জীবন যথেষ্ট নয়।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ওমার বলে—

'পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রসৈকত আর সমস্ত মরুভূমিতে যত বালিকণা আছে মহাকাশে তারার সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত তিনি মানুষকে সারপ্রাইজ করতে পছন্দ করেন। বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে মানুষ ততই সারপ্রাইজড হচ্ছে। এই যে আমরা পানির ওপরে ভাসছি, এই পানির বিশালতা জানতে মানুষকে কত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলো। সাধারণ ড্রপারের দশ ফোঁটা পানিতে যে পরিমাণ অণুপরমাণু আছে সেটার সংখ্যা মহাবিশ্বের মোট তারকার সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। এবার বোঝ তোর চোখের এক ফোঁটা পানি কত ওজন আর গুরুত্ব বহন করে।'

হালকা মুডে রুশো বলে—

'এইজন্যই তো আমি কাঁদি না।'

গভীর স্বরে ওমার বলে—

'আর আমি চাইলেও কাঁদতে পারি না।'

পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য মজা করে রুশো বলে—

'কেঁদে কেঁদে এত মূল্যবান মহাজাগতিক পানির অপচয় করার দরকার কি?'

একথা শুনে খুকখুক করে ওমার হেসে উঠল।

'বাহ্ তুই চোখের পানির দারুণ একটা নাম দিয়ে দিলি— মহাজাগতিক পানি। বাস্তবতাকে যিনি ভাববাদে প্রকাশ করেন, তিনিই তো গুরু। তোর মধ্যে গুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চট করে ওমারের দিকে ফিরল রুশো। সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞেস করল —

'এই তুই কি আমার লগে মজা লস। তুই দেখি আজ আমাকে গুরু গুরু করছিস। ঘটনা কী?'

'কেন, তুই কি আমাকে তোর মুরিদ করিসনি?'

'ওমার, আই অ্যাম সিরিয়াস!'

'আই অ্যাম সিরিয়াস টু!'

'যা ব্যাটা তুই মুরিদ হবি কেন, তুই তো আমার বন্ধু।'

বলে আবার আকাশের দিকে তাকায় রুশো।

ঠিক তখনই মায়ের কথা মনে পড়ল ওমারের। মা তাকে ইসহাক হুজুরকে বন্ধু বানাতে বলেছেন।

'আমি তাকে কোনোদিন স্পর্শ করিনি। প্রথম পরিচয়ের দিন সে নিজে থেকে আমার দিকে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, আমি সে হাত স্পর্শ করিনি। তার মানে এই নয় যে আমার ইচ্ছে করেনি বা আমি ভীরু ছিলাম। ওটা ছিল আমার রেসপেক্ট। ভালোবেসে সবাই বলে 'লাই ইউ', কিন্তু আমি তাকে সেটা বলিনি, আমি তার লাভ ইউ বলার উত্তরে চিঠিতে লিখেছিলাম 'আই রেসপেক্ট ইউ'। আমি সন্দিহান ছিলাম সে ব্যাপারটা বুঝবে কিনা। সে বুঝেছিল এবং ভীষণভাবে বুঝেছিল। আমার প্রতি তার ভালোবাসা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে পরে জনিয়েছিল যে সেদিন থেকেই সে আমাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। আর সেই স্বপ্নটা আমি তাকে প্রথম দেখাতেই দেখে ফেলেছিলাম। সেটা একটা মজার ঘটনা ছিল।

আমাদের স্কুলটা পাশাপাশি। তখন সে পড়ত ধানমন্ডি গার্লস্ এ ক্লাস নাইনে, আর আমি পড়তাম ধানমন্ডি বয়েজে ক্লাস টেন-এ। আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সে এসেছিল তার স্কুল টিমের সাথে। আমি তখন মঞ্চে আমার বিপক্ষের দলকে তুলাধুনা করছি। সে অবস্থায় হঠাৎ করেই আমার চোখ পড়েছিল তার ওপর। অডিটোরিয়ামের এক কোনে সে আলো করে বসেছিল। চোখ পড়তেই কী হলো জানি না। মঞ্চের বক্তার দিকে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত অডিয়েন্স তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু তার তাকানোটা ছিল অন্যরকম। আমি তার মুগ্ধতা টের পাচ্ছিলাম। আমার সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল, আমি তোতলাতে শুরু করেছিলাম, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ক্ষুরধার আর কঠিন মারপ্যাঁচের যুক্তিগুলো গুলিয়ে আমি খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার অবস্থা দেখে এতক্ষণের ভাবগম্ভীর নিলনায়তন মুহূর্তের মধ্যে হাসি কৌতুকে ভরে গেল। আমি মনে মনে বলেছিলাম 'হু কেয়ারস্, আই গট ইউ'। সেদিন আমার বাজে পারফরমেন্সের কারণে আমার টিম হেরে গিয়েছিল কিন্তু আমি জয় করে নিয়েছিলাম সারা পৃথিবী।

সেদিনের পর থেকে আমি ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি উড়তাম, আর জেনেছিলাম প্রেমে পড়লে মানুষ পাখি হয়ে যায়। সে পড়তে ভালোবাসত, আমিও। আমার ধারণা সে মেট্রিক পাশ করার আগেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হাজারখানেক বই পড়ে ফেলেছিল। কী পড়ব এটা নিয়ে আমাকে আর ভাবতে হতো না। আমরা প্রচুর

চিঠি লিখতাম। তার সেই সব চিঠির অর্ধেক থাকত বুক রিভিউ বাকি অর্ধেক উথাল-পাথাল প্রেমের মহাকাব্য।

ইন্টারমিডিয়েটে আমি ঢাকা কলেজ থেকে ঢাকা বিভাগের মধ্যে বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। সেটা তার কারণে। সে আমাকে বিষয় ভিত্তিক বইগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করে এনে দিত। পক্ষে-বিপক্ষে নোট তৈরি করে দিত। প্রতিযোগিতার আগে আমরা দুজনে সেই বিষয়ে বিতর্ক করতাম। সে আমাকে সবার মধ্যে সেরা দেখতে চাইত। সে ছিল সেই মেয়ে, সে এমন কেয়ারিং ছিল যে, সে পৃথিবীর যে পুরুষের পাশে থাকবে সে সেরা হতে বাধ্য। আমার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হতো, কারণ আমি লামিয়াকে পেয়েছিলাম। যদিও আমি ওর একটা সিক্রেট নাম দিয়েছিলাম। আমি ওকে 'মাটি' নামে ডাকতাম। আমি তাকে আমার জীবনের শেষ গন্তব্য হিসেবে মেনেছিলাম। মাটিই তো জীবিত প্রাণের শেষ গন্তব্য, তাই না।

আমার পরের বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনে ভর্তি হলো সে। তার স্বপ্ন ছিল ডিপ্লোম্যাট হওয়া। সে এতটাই মেধাবী আর আকর্ষণীয় ছিল যে, তার পক্ষে যা ইচ্ছে হবে সেটাই সে হতে পারত। তার কারণে আমার অসাধারণ রেজাল্ট হওয়া শুরু হলো। আমরা সারাদিন একসাথে থাকতাম। একাডেমিক পড়া আর বাইরের পড়া মিলে আমরা দুজন মিলে ডুবে থাকতাম পড়ার জগতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের জুটিটাকে বলা হতো শ্রেষ্ঠ জুটি। আউটডোরে ক্রিকেট ইনডোরে বিতর্ক আর ক্লাসের ভালো রেজাল্ট এসব নিয়ে আমিও তখন অনেকের হার্টথ্রোব। এর মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ডিবেটিং সোসাইটি থেকে আমাকে মনোনিত করা হয়েছে ইউনাইটেড এশিয়া ডিবেটিং চ্যাম্পিওনশীপে অংশ নেওয়ার জন্য। পনেরো দিনের জন্য যেতে হবে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ। লামিয়াকে ছেড়ে পনেরো দিন। আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু লামিয়া আমার সাকসেস দেখতে চায়। সে যখন বলে আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ, তখন তাকে প্রাউড করা ছাড়া আমার এই জীবনে আর কোনো লক্ষ্য থাকে না। যে আমি লামিয়াকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে ঢাকার বাইরে যেতে চাইতাম না সে-ই আমাকে লামিয়া জোর করে ইন্দোনেশিয়া পাঠিয়ে দিল।

কথা ছিল ফেরার সময় লামিয়া ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করবে। না সে আসেনি। আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে চলে গেছি। হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ওর কিছু হয়নি তো। অসুখ, দুর্ঘটনা এমন কিছু! তার বাসায় ফোন করে জেনেছি সে ঠিক আছে। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে বলে রুম বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে। হতে পারে, হতে পারে মানে সেটাই ঠিক কারণ লামিয়ার মাইগ্রেন ছিল। পরদিন সে ইউনিভার্সিটিতে আসেনি। এমনটা কি হতে পারে! আমি পনেরো দিন পর ঢাকা

ফিরলাম অথচ আমার সাথে দেখা করার কোনো আগ্রহ দেখছি না। এবার আমার মনে সন্দেহ জাগা শুরু হলো। আর সেটার জন্য আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। মহসিন হলের সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের দশ-বারো জন চিহ্নিত ক্যাডার আমাকে কলাভবনের সামনে ঘিরে ধরল। না, তারা আমার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি, শুধু বলল এনায়েত ভাই আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। শুনে আমার বুকটা ধক করে উঠল। এনায়েত হলো মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। এমনকি ভিসিও তার কথায় উঠে বসে। সেই এনায়েত তাকে কেন ডাকবে। সে তো কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। ছেলেগুলো মারমুখি না হলেও তাদের চোখে-মুখে একটা থমথমে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমি তাদের বললাম 'ঠিক আছে আমি পরে এনায়েত ভাইয়ের সাথে দেখা করব, এখন একটু বিজি আছি।'

দলের একজন আমার কাঁধে হাত রেখে শীতল কণ্ঠে বলল 'আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছেন, এক্ষুনি।'

মনোভাব দেখে বুঝলাম এদের সাথে এখন কোনো তর্ক করে লাভ নেই। আমি বললাম 'চল'।

ওরা আমাকে মাঝখানে রেখে মধুর ক্যান্টিনের দিকে হাঁটা শুরু করল। মধুর ক্যান্টিনের পাশেই একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে এনে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ওরা সবাই চাপাচাপি করে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বসতেই সেটা বিকট সাইরেন তুলে চলতে শুরু করল।

আমি পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যাম্বুলেন্সে করে আমাকে কোথায় নিচ্ছ?' একজন পেছন থেকে কৌতুকের স্বরে বলল— 'আপনার একটু চিকিৎসা করা দরকার তাই ডাক্তার এনায়েতের কাছে নিয়া যাচ্ছি।'

এটা শুনে বাকিরা হেসে উঠল। আমার মাথায় তখন চিন্তার ঝড়। কী ঘটতে যাচ্ছে আমার সাথে, কেন হচ্ছে এসব। কি করেছি আমি?

অ্যাম্বুলেন্সটা থামল গুলশান এলাকার একটা বাড়ির সামনে। মূল গেটটা খুলে গেলে সেটা সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেল। একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে গেটটা বন্ধ করে দিল। বাড়ির নিচতলার ড্রয়িংরুমে আমাকে বসিয়ে ওরা সবাই চলে গেল। প্রায় বিশ মিনিট পর সরকারি দলের ছাত্র নেতা এনায়েত এসে ঢুকল। আমি দেরি না করে সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই আমাকে এভাবে উঠিয়ে আনার কারণ কী?'

সোফায় মুখোমুখি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল—

'তুমি কিছু বুঝতে পারোনি?'

'না ভাই।'

পকেট থেকে বেনসন সিগারেটের প্যাকেট বের করে বেশ আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল এনায়েত। লম্বা করে কয়েকটা টান দিয়ে নাকে মুখে ভুসভুস করে ধোয়া ছাড়ল। আমি বুঝতে পারছি আমাকে সে যেটা বলতে চায় সেটা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর আমার দিকে না তাকিয়ে স্থির তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে। রুমের মধ্যে গুমোট নীরবতা। আমার অবস্থা আমি যেন দণ্ড শোনার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছি বিচারকের দিকে, পুরো ঘটনাটায় আমি একটুও ভয় পাইনি, কারণ আমি জানি আমি কোথাও কোনো অপরাধ করিনি। কিন্তু আমি কোনোভাবেই কোনো অনুমান করতে পারছি না আমাকে কী শুনতে হবে। একইভাবে এনায়েত তাকিয়ে আছে সিগারেটের মাথার জ্বলন্ত আগুনের দিকে, সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলল—

'তুমি কি জানো কার জন্য তুমি ইউনাইটেড এশিয়া ডিবেটিং কমপিটিশনের গ্রুপে চান্স পেয়েছিলে?'

এই প্রশ্নে আমি অপমানিত বোধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলি, 'কারো জন্য চান্স পেতে হবে কেন? আমি নিজের যোগ্যতায় চান্স পেয়েছি।'

এবার সরাসরি এনায়েত আমার চোখের দিকে তাকাল। মনে হলো এনায়েত তার নিজের ভেতরে ফিরে এসেছে। মনে হলো নিজেকে সামলে নিয়েছে, একটা হালকা হাসি ফুটে উঠল মুখে, বলল—

'আজ থেকে জানবে নিজের যোগ্যতায় সবকিছু অর্জন করা যায় না।'

আমি মাথা ঠান্ডা রেখে বললাম—

'আপনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন এনায়েত ভাই?'

'এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি আসলে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী সবাই রাজনীতির সাথে জড়িত। এটা নিশ্চই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখানে প্রতিটি সিলেকশন হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। তুমি না আমাদের রাজনীতি কর, না আমাদের রাজনীতি বিশ্বাস কর, না আমাদের রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল, কোনোটাই না। তবে তুমি কেন সুযোগ পাবে?'

'হ্যাঁ এখন জানতে চাইছি, কেন সুযোগ পেয়েছি?'

আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার সিগারেটের আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল—

'তোমার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তাই চান্স পেয়েছিলে।'

আমি ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছিলাম তাই কিছুটা উত্তেজিত স্বরে বললাম—

'কে সুপারিশ করেছে আমার জন্য?'

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এনায়েত বলল 'লামিয়া'।

নামটা শুনেই আমি হেসে দিয়েছিলাম।

'এনায়েত ভাই আপনি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন!'

আমার বলার ভঙ্গিটা এনায়েতের পছন্দ হয়নি। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠল।

'লামিয়ার কোনো কথা আমি ফেলতে পারি না।'

আমি একই ফান মুডে বললাম—

'কেন এনায়েত ভাই লামিয়া কী আপনার কোনো আত্মীয় হয়?'

এনায়েতের চেহারা পুরো বদলে গেছে। চোয়াল শক্ত করে বলল,

'আজ প্ল্যান ছিল তোমার চার হাত-পায়ের হাড্ডি ভেঙে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার, সেই জন্য অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করা ছিল, দ্রুত তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো যাতে মারের চোটে তুমি মারা না যাও। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে গেছে, কারণ লামিয়া আমাকে সেটা না করতে অনুরোধ করেছে।'

আমি বুঝে গেছি এখন এনায়েত কোনো ফালতু কথা বলছে না।

'কেন এনায়েত ভাই আমি কি দোষ করেছি, আপনি আমাকে কেন মারতে চান?'

'তোমাকে লামিয়ার জীবন থেকে সরে যেতে হবে।'

এখন আর আমি এনায়েতকে পরোয়া করছি না, একথা শোনার পর আর কোনো রাখঢাকের প্রয়োজন পড়ে না তাই আমি চ্যালেঞ্জের সুরে বললাম, 'কেন? কেন আমাকে লামিয়ার জীবন থেকে সরে যেতে হবে?'

'কারণ লামিয়াকে আমি ভালোবাসি।'

'হোয়াট।'

'ইয়েস, অ্যান্ড শি লাভ মি টু।'

আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। এনায়েতের প্রথম কথাটা সত্য। লামিয়াকে অনেক পুরুষ পছন্দ করে, ওর মতো এমন সুন্দরী আর মেধাবী নারীর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। এসব আমি দেখে অভ্যস্থ, কিন্তু এনায়েতের দ্বিতীয় কথাটা মিথ্যা। এটা কোনোভাবেই হতে পারে না। তাই এনায়েত আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্য বলল,

'তোমাকে ইন্দোনেশিয়া পাঠানোর মূল কারণ এটাই, তোমাকে কিছুদিনের জন্য লামিয়ার কাছ থেকে দূরে রাখা।'

'এর মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিষয়টা তোমাকে জানানোর। তোমাকে গুম করে সরিয়ে দেওয়া আমার জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না কিন্তু যেহেতু লামিয়া নিজে থেকেই তোমার সাথে আর থাকতে চায় না, আমার সাথে থাকতে চায়, তাই স্বাভাবিকভাবে সরে আসার জন্য তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। ঠিক এখন

থেকে আমি যেন তোমাকে আর লামিয়ার ত্রিসীমানায় না দেখি। এরপরও তুমি বাড়াবাড়ি করলে কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ।'

আমাকে লা জবাব করে দিয়ে এনায়েত আর একটা সিগারেট ধরাল। মুখের কালিমা আর নেই। তার সিগারেট খাওয়ার একটা বৈশিষ্ট ধরে ফেলেছি আমি। এনায়েত প্রতিবার দুইটা করে লম্বা টান দেয় একসাথে। নাকে মুখে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তার দেখাদেখি আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমার নিঃশ্বাস নিতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। এখান থেকে বের হতে হবে। উপসংহার টেনে এনায়েত বলল, আমি তোমার একটা উপকার করতে চাই, লামিয়াকে দ্রুত ভুলে যেতে তোমাকে সাহায্য করতে চাই। বুঝতে পারছি তুমি আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছ না। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে, তখন ভালোবাসাটা ঘৃণায় পরিণত হবে। সেটা তোমাকে তাকে ভুলে যেতে অনেক হেল্প করবে।'

বলেই পকেট থেকে একটা ঠিকানা লেখা কাগজ আমার হাতে দেয়। সব যেন প্ল্যান করেই রেখেছে।

'আগামীকাল দুপুর দুইটায় আমার ফ্ল্যাটে এসো। ঠিক দুইটায়, আগেও না পরেও না। আমার পোলাপান আর সিকিউরিটিকে তোমার নাম বলে রাখব। ফ্ল্যাটের দরজা আনলক করা থাকবে। তুমি নিঃশব্দে ঢুকে পড়বে, আমার বেডরুমের দরজাটা আলতো করে খোলা থাকবে, তুমি উঁকি মেরে দেখে চুপচাপ চলে যাবে।'

একটা লাম্পট্যের হাসি ছড়িয়ে পড়ে এনায়েতের মুখে। 'ও হাঁ, তোমাকে একটা থ্যাংকস্ দিতে চাই, তুমি লামিয়াকে কখনো স্পর্শ করনি বলে। আর পাশাপাশি তোমার জন্য একটা আফসোস তুমি লামিয়ার জীবনে স্কুল বালক থেকে পুরুষ হয়ে উঠতে পারনি, পরিণত হলে নারী খোঁজে নির্ভরতা, খোঁজে সামর্থ্যবান পুরুষ। তোমার ব্যর্থতা তুমি লামিয়াকে বোঝনি। তুমি বুঝতেও পারনি গত এক বছর ধরে আমার সাথে লামিয়ার সম্পর্ক। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ নিজের যোগ্যতা দিয়ে সবকিছু পাওয়া যায় না, ফরচুন বলেও একটা কিছু আছে। কাল সময়মতো চলে এসো, তোমার জন্য স্পেশাল শো।'

হ্যাঁ, আমি সেই শো দেখতে গিয়েছিলাম। খুব গোপনে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম একটা ধারালো ছুরি। এনায়েত যা যা বলেছে সেটার জন্য হয় তাকে মরতে হবে নয়তো আমাকে। এই দুইয়ের বাইরে কোনো কিছু ঘটা সম্ভব না। আমি ঠিক সময়মতো গিয়ে পৌঁছেছিলাম এনায়েতের পরিবাগের ৫ম তলা ফ্ল্যাটে। আমি আমার পরিণাম নিয়ে কখনো ভাবিনি। কোথা থেকে যে এত সাহস আমার ওপর ভর করেছিল! ফ্ল্যাটের দরজার হাতলে হাত রাখতেই সেটা খুলে গেল। খুব নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, শুনশান নীরবতা চারিদিকে। আমি লামিয়ার গায়ের গন্ধ চিনি। চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস টেনে নিলাম,

হঠাৎ নিজেকে কুকুরের মতো মনে হলো, আমি যেন বাতাসে লামিয়ার ঘ্রাণ খুঁজছি। ঘ্রাণের ভেতরে লামিয়াকে খুঁজে না পেলেও ওর জুতোজোড়া ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। ধুর! একই রকম জুতো কতজনেরই তো হতে পারে তাই সে চিন্তা বাদ দিলাম। ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে দেখলাম পাশাপাশি দুটি রুমের বন্ধ দরজা। আমি কেন যেন কুকুরের মতো বারবার শ্বাস টানছি, যেন শ্বাস টেনে টেনে শিকারি কুকুরের মতো লামিয়াকে খুঁজছি। আমার এই আচরণ নিজের কাছেই অপরিচিত লাগছে। দ্বিধায় পড়ে গেলাম দুটো দরজার মধ্যে কোন রুমের দরজাটা আগে খুলব। অনুমান করে যে দরজাটা আগে খুললাম সেটাই ঠিক ছিল। হাতল ঘুরিয়ে দরজার চিকন ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রখর করে যা দেখলাম সেখানেই আটকে গেল দৃষ্টি। একটা চেয়ারের ওপরে ওড়না সালোয়ার-কামিজ আর অনেক চেনা মেরুন রঙের হ্যান্ডব্যাগটা পড়ে আছে। লামিয়ার প্রতিটি পোশাক আমার চেনা, আর ঠিক এমনই একটা মেরুন হ্যান্ডব্যাগ আমি গত জন্মদিনে ওকে উপহার দিয়েছিলাম। না এমন হতে পারে না, এমন হ্যান্ডব্যাগ নিউমার্কেটে অনেক পাওয়া যায়। দরজার ফাঁকটা খুব ধীরে ধীরে আরও একটু বড় করে নিজেকে রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। এল শেপের রুমটার বিছানা পাতা এল-এর মাথার দিকে। এনায়েত সরাসরি আমার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে। আর ওর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ওকে কোলবালিশের মতো জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তাতে কী! এই লালচে চুল এই ফরসা ত্বক এমন একটা মেয়েকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আমি তার চেনা স্বরে আদর করে ডাক দিলাম, 'লামিয়া'।

খুব ধীরস্থিরভাবে লামিয়া আমার দিকে ঘুরে তাকাল।

না, আমি এনায়েতকে খুন করিনি। বরং আমি নিজেই খুন হয়ে গেছি। একবার না দুইবার না প্রতিদিন খুন হচ্ছি, প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুন হচ্ছি, মিনিটে, সেকেন্ডে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে খুন হচ্ছি। এনায়েত আমার ভেতরে ঘৃণা তৈরি করতে চেয়েছিল, পারেনি। আমি ঘৃণা করতে শিখিনি, আমি ঘৃণা করতে পারি না। এটা কীভাবে সম্ভব যে আজ আমি যাকে ভালোবাসব কাল তাকেই আবার ঘৃণা করব। আমি জানি না এনায়েতের কথাই হয়তো ঠিক, ঘৃণা করতে পারলে হয়তো তাকে ভুলে যেতে আমার সুবিধা হতো। কিন্তু আমার যে ঘৃণা আসে না, কী করি। ভুলে থাকার জন্য ড্রাগস আর সঙ্গীতের ভেতরে ডুবে থাকলাম, সেটাও আমাকে শান্তি দিতে পারছে না। এত অস্থিরতা, এত অস্থিরতা! এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। একা থাকতে পারি না। ড্রাগস শরীরকে নিস্তেজ করে দেয়, হ্যালুসিনেশনের ভিতরে নিয়ে যায় কিন্তু মনের অতল স্পর্শ করতে পারে না। আর সংগীত মনের আগুনে জ্বালানি কাঠের মতো, আগুনটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার বন্ধু রুশোর প্রতি কেমন যেন অনুরক্ত হয়ে গেছি। রুশো পাশে না থাকলে আমার অস্থির লাগে। রুশো যেন একটা ফুল প্যাকেজ।

ওর কাছে সব আছে, ড্রাগস, মিউজিক, ফিলসফি, নেশা জাগানো তত্বকথা, অ্যাডভেঞ্চার। ওর এই সবকিছু আমার সাথে শেয়ার করে, আমাকে ব্যস্ত রাখে কিন্তু আমি আমার কষ্টটা ওর সাথে শেয়ার করতে পারি না। রুশোর জগৎ আমাকে গ্রাস করে ফেলে কিন্তু আমি আমার কষ্টের দরজাটা খুলতে পারি না। রুশোর সঙ্গ বন্ধুত্ব আমাকে শান্তি দিতে পারছে না। কী করব আমি?

আমার কষ্টটা মা টের পাচ্ছেন, একমাত্র তিনিই বুঝতে পারছেন কীসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমি। মা আপনার জন্য সালাম পাঠিয়েছেন আর বলেছেন আপনি যেন আমাকে বন্ধু করে নেন। আপনার মধ্যে কী আছে আমি জানি না। কিন্তু এই প্রথম আমার কষ্টের কথাগুলো কারো সাথে শেয়ার করলাম। এখন অনেকটা হালকা লাগছে। আমার অনেক কষ্ট, প্লিজ আপনি আমার কষ্টগুলো দূর করে দেন। আমি আর পারছিনা।'

শেষ কথাগুলো যখন ওমার বলছিল তখন ওর চোখ দিয়ে নীরবে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। বৃদ্ধ ইমাম ইসহাকের চোখটাও ছলছল করছে। এই তরুণটিকে প্রথম দিনই তার অন্যরকম লেগেছিল। আহ্ কী কষ্টটা বুকে নিয়ে ঘুরছে ছেলেটা। ওমারের জন্য স্নেহ আর মায়ায় পূর্ণ হয়ে গেছে ইমামের অন্তর। শার্টের হাতা

দিয়ে বারবার চোখ মুচছে ওমার। ইমাম তাকে কাঁদার সুযোগ দিচ্ছেন। আর অপলক তাকিয়ে আছেন ওমারের দিকে। এক সময় ওমার শান্ত হয়। ডলতে ডলতে আর মুছতে মুছতে চোখ লাল হয়ে গেছে। ওমারকে এখন একটা ছোট্ট শিশুর মতো লাগছে, মাথা নিচু করে বসে আছে ইমামের সামনে। ইমাম নরম হৃদয়ের মানুষ, তিনিও নিজেকে সামলে নিয়ে বলা শুরু করলেন—

'একটা শিশুর কাছ থেকে তার খেলনা কেড়ে নাও, সেই শিশুটা যেভাবে কাঁদবে কিছুক্ষণ আগে তুমিও ঠিক সেভাবে কেঁদেছ। আজ থেকে এগারো বছর আগে আমিও সেভাবে কেঁদেছিলাম যখন আমার ছেলেটা রোড এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল। সেই শিশু, তুমি তরুণ আর আমি বৃদ্ধ, বয়সে আমরা যেমনই হই না কেন আমাদের কাছ থেকে প্রিয় জিনিস কেড়ে নিলে একই রকম দুঃখ লাগে। এই হঠাৎ আসা দুঃখ-কষ্ট আমাদের শিক্ষা দেয় সুখের জীবন কত অনিশ্চিত কত ভঙ্গুর।

হোঁচট খেলে ব্যথা লাগে, আর সেই হোঁচট খেতে খেতেই মানুষ হাঁটতে শেখে, আর মানুষ কষ্ট পেতে পেতে পরিণত হয়। জীবনের শুরুতেই তুমি যে কষ্টটা পেয়েছ এটাকে যদি তুমি শিক্ষা হিসেবে নাও তবে তোমার বাকি জীবন কোনো কষ্টই তোমাকে এমন অস্থির আর ভেঙে ফেলতে পারবে না।

এই বিশ্বজগৎ একটা পাঠশালা। এখানে প্রতিটি ঘটনার ভেতরেই একজন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক মানে কোনো ব্যক্তি বা অদৃশ্য কিছু নয়। সেই ঘটনাটা নিজেই একজন শিক্ষক। তোমার জীবনের এই ঘটনায় তুমি একটা প্রাথমিক শিক্ষা পেলে। আর আমি জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে তোমাকে বলছি, আমি এই রকম অনেক শিক্ষা পেতে পেতে একটা উপসংহারে পৌঁছেছি, আর সেটা হলো— তোমার হাতে তোমার কোনো প্রিয় জিনিসই নিরাপদ নয়। যেকোনো সময়ে সেটা কেড়ে নেওয়া হবে, এমনকি তোমার প্রিয় জীবনটাও। তাই শিক্ষা হলো, যা পেয়েছ তার জন্য এত উল্লাসের কিছু নেই, যা হারিয়েছ তার জন্য এত বিষাদেরও কিছু নেই।

ঘটনার শিক্ষকেরা এই ফিলোসফিটাই শিক্ষা দেয়।'

'কষ্ট পেয়ে আপনিও তো কেঁদেছিলেন।'

'ভালোবাসা এক ধরনের অভ্যাস, দেখ না সিগারেট ছাড়তেও মানুষের কত কষ্ট হয়। তাই বিচ্ছেদের কথা মাথায় রেখেই ভালোবাসতে হবে, এই জন্য আমাদের ধর্মে বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলা হয়। এই মৃত্যু মানেই বিচ্ছেদ। সুখের সময় আমরা বিচ্ছেদের কথা পুরোপুরি ভুলে যাই। তখন সেই সুখটা সিগারেটের মতো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যা ছাড়তে পরে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, আমি সেই পরিমাণেই কেঁদেছিলাম যে পরিমাণে বিচ্ছেদ ভুলে থাকার বদঅভ্যাস আমার ভেতরে গেড়ে বসেছিল।'

'এত নির্লিপ্ত আর আসক্তিহীন ভালোবাসা সম্ভব? মানে বলতে চাচ্ছি কাউকে বা কোনো কিছুকে ভালোবাসব আর ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকব তার বিচ্ছেদের! এমন করে ভালোবাসা সম্ভব?'

'তেমন ভাবে ভালোবাসতে পারনি বলেই তো আজ কষ্ট পাচ্ছ। তোমার ভালোবাসার মানুষকে হারানোর কথা তোমার কখনো মনেই আসেনি, তাই না?'

বিষাদ মাখা মুখে ওমার মাথা ঝাঁকায়।

'তুমি ভেবেছিলে এমন সুখে এই একই গতিতে জীবনটা চলতে থাকবে।'

একটা মিষ্টি পবিত্র হাসি ইমাম সাহেবের সারা মুখ ছড়িয়ে যায়, তিনি বলেন—,

'ভালোবেসে তোমরা বলো তোমাকে ছেড়ে কোনোদিন যাব না। বোকার মতো এইসব কথা তারাই বলে যারা সেই সব শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়নি। তোমার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যত বেশি বস্তু তোমার হৃদয়ে জায়গা করে নেবে তত বেশি তুমি বিচ্ছেদ বেদনা ভোগ করবে।'

ওমার প্রশ্ন করে—

'তাই বলে কি কাউকে বা কোনো কিছুকে ভালোবাসব না?'

শিশুর মতো চাপা হাসি দিয়ে ইমাম সাহেব বললেন—

'অবশ্যই ভালোবাসবে। ভালোবাসাটা হবে বাইন মাছের মতো। বাইন মাছ চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি, সাপের মতো দেখতে।'

'সেই বাইন মাছ কাদার ভীতরে থাকে কিন্তু তার গায়ে কাদা লাগে না। তার গায়ে একটা পিচ্ছিল বর্ম লাগানো থাকে। মানুষের জন্য 'জ্ঞান' হলো সেই বর্ম।'

ওমার জিজ্ঞেস করে, 'কীসের জ্ঞান?'

কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন ইমাম সাহেব, চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—

'মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাসে জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, মরে যায়। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ জানতেও পারে না কেন সে পৃথিবীতে এসেছিল। এই না জানার কারণে সে জঙ্গলের বাসিন্দা হয়ে জীবন কাটায়। অন্যান্য প্রাণীরা যেভাবে বাঁচে, সেও তেমনিভাবে বাঁচে। সে বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতা করে। জঙ্গলে যেমন একজনকে বেঁচে থাকতে হলে অন্যজনকে মেরে ফেলতে হয়।'

ওমার যোগ করে বলে, 'এটাকে বলে সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট, ডারউইন তার ইভোলিউশন থিয়োরিতে এমনটা বলেছিলেন।'

ওমারকে চমকে দিয়ে ইমাম সাহেব বললেন, 'না, কথাটা ডারউইন বলেননি। ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পেসিস পড়ার পর তার ব্যাখ্যায় ইংলিশ দার্শনিক এবং বায়োলজিস্ট হারবার্ট স্পেনসার প্রথম বলেছিলেন বাক্যটা

'সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট'। অবাক বিস্ময়ে ইমাম সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওমার। সেটা বুঝতে পেরে ইমাম সাহেব বললেন—

'এত অবাক হইয়ো না, 'মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে' এই মতবাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করার জন্য তরুণ বয়সে অনেক পড়তে হয়েছিল, এটা সেইসব পড়ার ফল। যাই হোক, বলছিলাম 'পারপাস অব লাইফ' এর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান না থাকার ফলে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করে শেষে জঙ্গলের প্রাণী হয়ে মরে যায়, অথচ তার জন্ম হয়েছিল মানুষ হিসেবে, মৃত্যুটাও হওয়ার কথা ছিল মানুষের মতো। এই যে সে জঙ্গলের পশুর মতো বাঁচল এর কারণ তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ভোগ। ভোগ মানে সুখ, এই সুখের জন্য কি না সে করেছে, সবচেয়ে বড় ভুল যেটা সে করেছে সেটা হলো সুখের জন্য বিচ্ছেদকে ভুলে গেছে। টাকা, বাড়ি-গাড়ি, নাম-যশ নারী, এসবকে ভালোবেসে হৃদয়টা ভর্তি করে রেখেছিল। এসব এমন আসক্তি যা বিচ্ছেদকে ভুলিয়ে দেয়। অথচ বিচ্ছেদই মানুষের চরম পরিণতি।'

ইমামের এসব সহজ-সরল অথচ গভীর অর্থবোধক কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে ওমার প্রশ্ন করে—

'তাহলে হৃদয়টা তৈরি করা হয়েছে কী জন্য? ভালোবাসার জন্যই তো নাকি?'

'তার আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, বলো তো এই মহাবিশ্ব অসীম না সসীম?'

'বিগ ব্যাং থিয়োরি মতে একটা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে অথবা কোনো সৃষ্টিকর্তার দ্বারা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাই যা কিছু সৃষ্ট তাই সসীম।'

'বাহ, সুন্দর করে বলেছ, এখন বলো, এই সসীম মহাবিশ্বের ভীতরে একটা অসীম বস্তু আছে, বলো তো সেটা কী?'

ওমারকে খুব বেশি ভাবার সময় না দিয়েই ইমাম সাহেব বললেন—

'সেই অসীম বস্তুর নাম হৃদয়। এই জন্য বলা হয় অন্তরের চাহিদা অসীম। এই অসীম অন্তর বা হৃদয় সৃষ্টি করা হয়েছে এক অসীম সত্তার জন্য, সেই অসীম সত্তার নাম— আল্লাহ।'

ওমার যেন সূত্রটা ধরতে পেরেছে তাই সে বলল, 'প্রথম যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম সেদিন আপনি বলেছিলেন "হৃদয় আল্লাহর ঘর"।'

'হ্যাঁ, সেদিন তোমার মনের অস্থিরতাটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। যখন আল্লাহর ঘরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থাকে তখন বান্দাকে অস্থিরতা গ্রাস করে। এটা বোঝার জন্য কোনো গায়েবি অথবা অলৌকিক ক্ষমতার দরকার পড়ে না। এটা সেই বিচ্ছেদের জ্ঞান যা ঘটনার ভীতর দিয়ে বিশ্বজগতের পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন বুঝতে পেরেছ মানুষ কেন কষ্ট পায়?'

'তা হলে কি মানুষ শুধু আল্লাহকেই ভালোবাসবে, কোনো মানুষ প্রাণী বা বস্তুকে ভালোবাসবে না? তাহলে ভালোবাসার অনুভূতি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?'

'ভালোবাসা মানে হচ্ছে রেসপন্সেবিলিটি বা দায়িত্ব। যখন তুমি কাউকে ভালোবাস তখন তুমি তার দায়িত্ব নাও। এই দায়িত্বটা তোমাকে কে দেন?

তিনি দেন, যিনি তোমার হৃদয়ের ঘর জুড়ে বসে আছেন, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের মালিক, সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেছেন, জীবে দয়া কর আর তার সমস্ত সৃষ্টিকে ভালোবাস। সেটা শুধু কথার কথা ভালোবাসা নয়, সেই ভালোবাসা এক বিশাল দায়িত্ব। তাই তার জন্য যখন ভালোবাসবে তখন এই সৃষ্টি জগতের কেউ তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। তখন তোমার ভালোবাসা হবে পৃথিবীর আলো-বাতাস আর পানির মতো, যা সমস্ত পোকামাকড় জীবজন্তু থেকে শুরু করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান ভোগ করে। দেখ তুমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে তোমার জন্য, আর তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর জন্য। তুমি যখন তাঁর হবে এই বিশ্বজগৎ সবকিছু তোমার হবে। তুমি যখন তাঁর হবে না তখন এই বিশ্বজগৎ সবকিছু তোমাকে বিচ্ছেদ বেদনা দেবে। তাঁর সাথে এই সম্পর্কটাই প্রকৃত প্রেম। আর এই প্রেমটাকে বলে ইবাদত। এই প্রেমের জন্যই তোমাকে অসীম এবং অমূল্য এক বস্তু দেওয়া হয়েছে। যেটার নাম হৃদয়। সেই হৃদয়ের ব্যবহার আর প্রকৃত প্রেমের কায়দাটা শেখোনি বলে আজ এত কষ্ট পাচ্ছ।'

এশার নামাজের পর রাতের খাবার শেষ করে ইমাম সাহেব যখন তার কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় ওমার এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। রাতের এই সময়টা তিনি দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দেন না। মসজিদের খাদেমের নিষেধ উপেক্ষা করে অনেকটা জোর করেই ওমার ইমাম সাহেবের রুমে প্রবেশ করেছিল। ঢুকেই বলেছিল 'আপনি কি আমাকে বন্ধু করে নেবেন।' ইমাম মজার ছলে বলেছিলেন, 'তোমাকে বন্ধু বানালে আমার কী লাভ?'

ওমার বলেছিল 'আপনাকে একটা মজার গল্প শোনাব।'

'মজার গল্প পৃথিবীতে আর কি অবশিষ্ট আছে!'

হ্যাঁ, আর একটা মাত্র গল্প পৃথিবীতে অবশিষ্ট আছে। আজ এটা বলা হলে পৃথিবীতে আর কোনো গল্প অবশিষ্ট থাকবে না।'

মা বলেছে বলেই আসা নইলে হুজুর শ্রেণির লোকদের প্রতি ওমার কখনো কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি।

একধরনের হালকা এবং চটুল মেজাজে কথাগুলো বললেও ওমার খুব দ্রুত তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বুঝতে পারছিল। শিশুর সারল্য আর ব্যক্তিত্ব মিলে ওমারকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তিনি। এমন একজন বৃদ্ধ ইমাম চিন্তা-ভাবনায় এতটা আধুনিক আর বিজ্ঞানমনস্ক হবেন শুরুতে বুঝতে পারেনি ওমার। কথায় কথায় কখন যে ওমার নিজের কষ্টের কথাগুলো বলা শুরু করেছে সেটা সে টের পায়নি। তিনি এমন স্নেহ আর মমতামাখা চেহারা নিয়ে ওমারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যে তিনি যেন তার বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই তার কাছে কোনো কিছু গোপন করে লাভ নেই। বুক খালি করে কথা বলতে পেরেছে বলে আজ নিজেকে অনেক নির্ভার লাগছে। ইমাম ইসহাকের রুম থেকে ওমার যখন বের হয় তখন রাত প্রায় ১২টা ছুই ছুই করছে। বের হয়েই দেখে মসজিদের বাইরের ফুটপাতে রুশো বসে আছে ওমারের জন্য। রুশোকে বাইরে রেখে বলেছিল আধা ঘণ্টার জন্য যাচ্ছে, এরপর রুশোর কথা ওমার ভুলে গিয়েছিল।

'ও মাই গড, তুই এখনও আছিস। ভেতরে চলে আসতি।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণ মসজিদে ঢোকার জন্য আমার শয়তানের সাথে যুদ্ধ করছিলাম।'

'তোর পাসোর্নাল শয়তান আছে নাকি?'

রুশো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে,

'আছে তো, জিম মরিসন মরার পর তার গুলা সব এখন আমার কাছে।'

'কী করলি এতক্ষণ এখানে বসে বসে?'

'এখানে বসে বসে আমি পাঁচটা স্টিক বানিয়েছি। ভাবছিলাম একটা শেষ করেই তোকে দেখতে যাব। কিন্তু এমন পিনিকে পাইল যে চারটা শেষ করে ফেললাম। তারপর ডিমওয়ালা গেল, ডিম খাইলাম, পিঠাওয়ালা গেল, পিঠা খাইলাম, মুড়ি ভাজা গেল, তাও খাইলাম। বোঝ তাহলে তোর মসজিদে ঢোকার প্ল্যান করতে গেলাম আর দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু আমাকে সার্ভিস দেওয়া শুরু করল। বুঝছস আমার ধর্মের এনজেলরা আমাকে বিপথগামী হতে দেয় না।'

ওমার বেশ একটা ফুরফুরা মেজাজে আছে। তাই রুশোকে ঘাটানোর জন্য ফুটপাতে ওর পাশে বসে বলে—

'কোনটা তোর ধর্ম?'

'কেন তুই জানিস না, যে ধর্ম প্রবর্তন করেছে লালন, যে ধর্ম প্রবর্তন করেছে জিম, সেটাই আমার ধর্ম।'

'তারা ধর্ম প্রবর্তক নাকি গড?'

'লালন আমার কেউ না, আমি জীমের কথা বলতে পারি। ষাট আর সত্তর দশকের আমেরিকান পোলাপান জীম কে গড মনে করত। শোন, মানুষ যেমন পূজা

দিতে পছন্দ করে, ঠিক তেমনি মানুষ পূজা পেতেও পছন্দ করে। জনপ্রিয়তার সাথে যদি নিজস্ব প্রথা-বিরোধী দর্শন থাকে তাহলে তুইও একটা ধর্ম বানাতে পারবি।'

'এত সোজা?'

'না, এত সোজা না, এটার পেছনে তোকে লেগে থাকতে হবে। পুরা জীবন ব্যায় করে তোকে একটা রীতি বা ফ্যাশন দাঁড় করাতে হবে। পৃথিবীতে এত এত জনপ্রিয় গায়ক আছে কিন্তু গড হয়ে উঠতে পেরেছে কয়জন?'

প্রশ্নটা করে হঠাৎ ওমারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে রুশো বলে, 'মসজিদের মোল্লার সাথে এতক্ষণ কী করলি?'

ওমার বলল—

'হুজুর লোকটাকে আমার পছন্দ হয়েছে, হৃদয়, ভালোবাসা, এসব জিনিস যে ধর্মেও আছে সেটা তিনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন।'

'তুই ইমপ্রেসড্?'

ওমার হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'অনেকটা'।

'খাইসেরে হুজুর তো তোকে আফিম খাওয়াইয়া দিছে মনে হচ্ছে, তুই হলি গাঁজার লোক, তুই আফিম খাবি কেন?'

বলেই পকেট থেকে পাঁচ নম্বর স্টিকটা বের করে ওমারের হাতে দিয়ে বলে- 'ধরা'।

ওমার একটা হাসি দিয়ে রুশোর গাঁজা ভরা সিগারেটসহ হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'এক্ষুনি মসজিদ থেকে আসলাম ইমাম সাহেবের সঙ্গটা আমার ওপর ইফেক্ট করেছে, এখন পিনিক নেওয়ার মুডে নেই, তুই ধরা।'

অবাক হয়ে রুশো বলে—

'হুজুরের সাথে এক সিটিংয়েই এই অবস্থা! এই কারণেই কার্ল মার্কস বলেছে- রিলিজিওন ইজ অপিয়াম ফর দা পিপল।'

ওমার মজার ছলে বলে—

'হুজুরের কাছে গেলাম তিনি আফিম খাওয়ালেন, তোর কাছে আসলাম তুই এখন গাঁজা খাওয়াবি। হুজুরের ধর্ম আফিম আর তোর ধর্ম গাঁজা। হুজুর আমার নতুন বন্ধু তুই আমার পুরাতন বন্ধু, কোনটারে ছাইড়া কোনটা ধরি। মুশকিলে পড়লাম দেখি।'

রুশো ওমারের খোঁচাটা টের পেয়েছে। জ্বলন্ত গাঁজার স্টিকে লম্বা টান দিয়ে অপলক তাকিয়ে আছে ওমারের দিকে, ওমারকে কেমন যেন অচেনা লাগছে।

কান্না যে এত স্বস্তির কে জানত! এত অস্থিরতার মূল কারণ বোধ হয় এটাই ছিল, সারা শহর জুড়ে সে একটা নিরাপদ নিশ্চিত কান্নার জায়গা খুঁজে বেড়িয়েছে। ইমামের রুমে বসে অঝোর ধারায় কান্নার পর ওমারের মনে হয়েছে তার ওপর থেকে বিশাল একটা চাপ নেমে গেছে। কান্নার সাথে সাথে অনেক কিছু ধুয়ে গেছে। লামিয়ার যেটুকু এখন আছে সেটা অভ্যাস। ইমামের কাছ থেকে জেনেছে অভ্যাসটাই আসলে কষ্ট। এই অভ্যাসটুকু কাটানোর জন্য ওমার আপাতত ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ইমামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমাম তাকে বলেছিলেন,

'তোমার জন্য একটা সুখবর আছে।'

কৌতুহল নিয়ে ওমার তাকায় ইমামের দিকে। ইমামের সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি, তিনি বললেন,

'যিনি তোমাকে কষ্ট দিয়েছেন, তিনিই তোমার জন্য সুখবর পাঠিয়েছেন।'

বলে তিনি কোরআনের সূরা ইনশিরাহ থেকে পঞ্চম আয়াতটি পাঠ করলেন এবং ভাবার্থটা ওমারকে বলে দিলেন- 'নিশ্চয়ই কষ্টের পরে রয়েছে সুখ।'

সেদিনের পর থেকে ওমারের ভাবনা জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ইমাম তাকে ভিন্নভাবে ভাবতে সাহায্য করেন। সাধারণ হুজুরদের মতো তিনি বেহেশতের লোভ অথবা জাহান্নামের ভয় দেখাননি। তিনি বলেছেন 'পারপাস অব লাইফ' আর শিখিয়েছেন প্রকৃত ভালোবাসার নিয়মকানুন। বিচ্ছেদ-বেদনার বস্তুগত কোনো সান্তনা নেই। লামিয়াকে হারানোর যে বেদনা ওমার ভোগ করছে তার উপশম সে কোনো কিছুতেই পায়নি। বন্ধুদের সঙ্গ হইহুল্লোর, ড্রাগস, কোনো কিছুতেই না। ওমার বুঝতে পেরেছে সেই বেদনার উপশম লুকিয়ে আছে ভাববাদে। মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো অনুভব হয় আত্মায়। চিন্তা এবং দর্শন দ্বারা আত্মার অবস্থা পরিবর্তন করা যায়। আত্মাকে পার্থিব লোভ লালসা চাওয়া পাওয়া থেকে মুক্ত করতে পারলে যেকোনো বিচ্ছেদবেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ইমাম এটাকে বাইন মাছের জীবনের সাথে তুলনা করেছেন, কাদার মধ্যে থেকেও যে মাছের গায়ে কোনো কাদা লাগে না। তুমি বস্তুর সমুদ্রে থাকবে কিন্তু বস্তু তোমাকে ডুবাতে পারবে না। তুমি বস্তুকে ভোগ করবে কিন্তু বস্তু তোমাকে ভোগ করতে পারবে না। যখন বস্তুর লোভ

মানুষকে খেয়ে ফেলে তখন সেই মানুষের জীবন হয় পশুর মতো। যেমন খাবারের লোভ দিয়েই বিশাল প্রাণী হাতি আর হিংস্র প্রাণী বাঘ, ভল্লুক ও অন্যান্য প্রাণীকে পোষ মানানো যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভোগ যখন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেও তেমন পশুতে পরিণত হয়। মানুষ তখনই শ্রেষ্ঠ যখন সে ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আর না পারলে সে একটা সাধারণ প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। ইমাম বলেন, মানব চরিত্রকে ঠিকমতো না বোঝার কারণে পৃথিবীতে এত দুর্গতি। গত একশ বছরে যত হানাহানি হয়েছে এর পেছনে মূল কারণ হলো মানব চরিত্রকে বুঝতে না পারা।

মানব চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল তার একটি পুঁজিবাদ অন্যটি সাম্যবাদ। দুটোই ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদ মানুষকে ভোগের এমন অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে যে এই ভোগের কারণে মানুষ মানুষকে দাসে পরিণত করেছে, অন্যায়ভাবে বিভিন্ন দেশের সম্পদ লুট করেছে, দেশ দখল করেছে, উপনিবেশ তৈরি করেছে। ভোগের জন্য এমন কোনো অনাচার নেই যা এরা করেনি। পুঁজিবাদেরই আরেক নাম ভোগবাদ। অন্যদিকে ভোগবাদের এসব অনাচার দেখে একদল বিদ্রোহ করল। তারা মনে করল সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাই সকল দুষ্কর্মের মূল, তাই রাষ্ট্র ব্যক্তির সব সম্পদ কেড়ে নিল। ব্যক্তি তখন পরিণত হলো রাষ্ট্র নামক গোয়ালের জোয়াল টানা গরু। আগে যে শোষন করত সম্পদশালী পুঁজিপতি সেটাই এখন করছে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। অথচ মানুষের স্রষ্টা মানুষকে দিয়েছে নিয়ন্ত্রিত ভোগের অধিকার। মানুষ ভোগ করবে কিন্তু অপচয় করবে না। ভোগ করবে কিন্তু আরেকজনের অধিকার হরণ করে নয়, আরেকজনকে বঞ্চিত করে নয়। ইমাম বলেন, 'আত্মার মুক্তি হলো আসল স্বাধীনতা।' পার্থিব লোভ লালসা মানুষকে বন্দি করে রাখে, পরাধীন করে রাখে। আত্মার এই পরাধীনতা তৈরি হয় সম্পদের লোভে নয়তো নাম, যশ, পরিবার, মায়া, প্রেম, ভালোবাসার লোভে। মানুষের পুরো জীবন কালটাই যুদ্ধ, লোভলালসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পশু থেকে মানুষে পরিণত হওয়ার যুদ্ধ। এটাকেই বলে নাফস্ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইমামের কাছে বসে ওমার এসব মুগ্ধ হয়ে শোনে। নিজ ধর্মের এত সুন্দর ব্যাখ্যা সে আগে কখনো শোনেনি। এতদিন জেনে এসেছিল ধর্ম মানে শুধু অদৃশ্য বিষয়, যার কাজ মাটির নিচের ভয়াবহ অদৃশ্য শাস্তির জগৎ নয়তো মাথার ওপর আকাশের ওপারে সুখের জগৎ নিয়ে শুধু কথা বলা।

এখন জানছে তার ধর্ম শুধু ধর্ম নয়, এটি আইডিওলজি, এমন আইডিওলজি যা দিয়ে পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া যায়। পৃথিবীর যেকোনো তত্ত্ব দর্শনকে তুলনা করা যায়, মোকাবিলা করা যায়। ওমার প্রতিদিন আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তার সাথে সময় কাটায়। সারাজীবন ওমার যা কিছু পড়েছে তার সবটাই যেন বৃদ্ধ ইমামের জ্ঞানের গণ্ডির মধ্য

ধরা, তিনি প্রতিটি প্রশ্নের দেন বাস্তবধর্মী উত্তর। ব্যক্তি, জাতি, জাতিপুঞ্জ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, শান্তি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রতিটি বিষয়ে একজন মসজিদের ইমাম এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন! অবাক হয়ে ওমার জিজ্ঞেস করে—

'আপনি এতকিছু কীভাবে জানেন?'

ইমাম যখন চুপ থাকেন তখন যেন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন, চট করে কোনো কথা বলেন না। যেকোনো কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তারপর কথা বলার সময় হলে, একটা শিশুর মতো নিষ্পাপ পবিত্র হাসি ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে ওঠে, তখন বোঝা যায় এখন তিনি কথা বলবেন। ওমার এখন তার প্রতিটি মুহূর্ত বুঝতে পারে। সেই হাসিমুখে ইমাম উত্তর দিলেন—

'অন্ধকার রাতে তোমাকে একটা জঙ্গলের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দেওয়া হলো সূর্য উদয়ের আগেই তোমাকে এই জঙ্গল পার হতে হবে, তখন তুমি প্রথমেই কী করবে?'

ওমার চট করে উত্তর দিল—

'প্রথমেই একটা টর্চলাইট জোগাড় করে নেব।'

'মাশাআল্লাহ্, দারুণ উত্তর দিয়েছ। বুদ্ধিমান মানুষ, অস্ত্র, লোকবল, খাবার, পানি, তাঁবু, ঔষধ এই সবকিছুর আগে প্রথমেই আলোর কথা চিন্তা করবে। এইসব ছাড়াও তুমি অন্ধকার জঙ্গলে চলতে পারবে কিন্তু টর্চ লাইট ছাড়া এক কদমও চলতে পারবে না। জঙ্গলে তোমার রাস্তাঘাট চেনা নেই কিন্তু এই আলো তোমাকে সাহস যোগাবে পথ চলতে। এবার তুমি আলো ফেলে ফেলে পথ চলছ। অচেনা পথের যেখানেই তুমি আলো ফেলছ সেটাকেই তুমি চিনতে পারছ। বিভিন্ন গাছপালা, খানাখন্দ, জীবজন্তু, থেকে নিজেকে রক্ষা করে করে বুঝে নিচ্ছ কোনটা বিপজ্জনক আর কোনটা উপকারী। অন্ধকার জঙ্গলটা হলো পৃথিবী, সূর্যোদয় পর্যন্ত আমাদের আয়ুকাল আর টর্চলাইট হচ্ছে সত্য। তোমার হাতে যখন সত্য থাকবে তখন সেই সত্য দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু তুমি যাচাই করতে পারবে। আমি সত্যটা ভালোমতো জেনেছিলাম তাই বাকিগুলো চেনা আমার জন্য সহজ ছিল।'

কয়দিন আগে রুশোর সান্নিধ্যের জন্য ওমার অস্থির থাকত, কারণ রুশো তাকে তার কষ্ট ভুলে থাকতে সাহায্য করত। ওমার ছিল রুশোর লিরিক, সুর, কম্পোজিসনের একনিষ্ঠ সমঝদার। গানে পিনিকে আর সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বন্ধুদের মহল্লায় ঘুরে ঘুরে আড্ডায় ওমারকে আনন্দে রাখতে চাইত। রুশোর এই প্রচেষ্টা ওমারকে আপ্লুত করত। রুশোর মতো বন্ধু পাওয়াটা সৌভাগ্যের মনে করত। অথচ এখন তার সময়টা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। অর্ধেক রুশোর আর অর্ধেক ইমামের। বিপরিতমুখী দুই বন্ধুত্বের মাঝে কাটছে ওমারের দিন-রাত। রুশো আর নেশা করে মজা পায় না, ওমার নেশা ছেড়ে দিচ্ছে। রুশোর খুব পীড়াপীড়িতে দুই-এক টান দেয়। রুশোর মন খারাপ হলেও সে বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ওমারের

বদলে যাওয়াটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছে। রুশোর সাথে রাতে থাকাটা কমিয়ে দিয়েছে ওমার। এই শহরে ওমারের জন্ম হলেও রুশো তাকে এই শহরটাকে চিনিয়েছে। কত অলিগলি আর নিষিদ্ধ জায়গা সে চিনেছে রুশোর জন্য। ঢাকার গভীর রাতের অপরূপ সৌন্দর্য সে রুশোর কারণেই দেখতে পেরেছে। রাতের সোয়ারী ঘাট, বাদামতলী আর কাওরান বাজারের তরকারি আড়তের কর্মব্যস্ততা, নেশা ধরা গন্ধ আর টাটকা সবজি ভাজির সাথে গরম গরম পরোটার মজা কোনোদিনও তার নেওয়া হতো না রুশো ছাড়া। কাঁটাবনের বস্তির মাসির সাথে বসে বসে গাঁজা টেনে ক্ষুধা লাগিয়ে গুড়ের ভাপা পিঠার সেই কী স্বাদ, রুশো ছাড়া এসব আনন্দ তার কোনোদিনও নেওয়া হতো না। বুড়িগঙ্গার মাঝিদের নৌকার ভাতের দোকানে বসে ঢেউয়ের দোলায় ঢুলতে ঢুলতে নদীর মধ্যে ১৫ টাকায় ইলিশ ভাজি আর সাদা ভাতের সাথে মাছের তেল মাখিয়ে খাওয়ার আনন্দের খোজ রুশোই এনে দিয়েছিল। সেই খুলে দিয়েছিল এই শহরের এক অদেখা জগৎ।

এখন ইমামের কাছে এসে জানতে পারছে জেনে হোক আর না জেনে হোক মানুষ এক আধ্যাত্মিক প্রাণী। তাকে ঘিরে আছে এক অদৃশ্য শক্তি। এই শক্তির নাম সার্বভৌম শক্তি বা ক্ষমতা। বস্তুবাদীরা সেই ক্ষমতাকে স্থাপন করে রাষ্ট্র ক্ষমতায়। এই ক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করে, বলে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। তারপর ভোট দেওয়া শেষ হলে জনগণ ক্ষমতা হারায়। এরপর সেই ক্ষমতা হাতবদল হতে থাকে প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, প্রধান বিচারপতি, স্পিকার। অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা এমন যা হস্তান্তর করা যায় না। আজ যিনি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কাল তিনি ক্ষমতা হারিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ইমাম বলেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা এমন যা কখনো কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। এই ক্ষমতা পরম, এই ক্ষমতা শুধুমাত্র অনন্ত অসীম সত্তার গুণ হতে পারে। 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ' আর 'শক্তির উৎস জনগণ' এর মধ্যে মানুষের বিশ্বাস আর বাস্তবতার বিশাল ফারাক। একসাথে এই দুটি বিশ্বাস কেউ ধারণ করতে পারে না। তোমাকে যেকোনো একটি সার্বভৌম শক্তির কাছে মাথা নত করতে হবে। ইমাম রাষ্ট্র চিন্তা আর দর্শনের এক নতুন আধ্যাত্মিক জগৎ ওমারের সামনে উন্মোচন করে দিচ্ছেন। তার ধর্ম বিশ্বাসের সাথে যে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এমনভাবে জড়িয়ে আছে সেটা ওমার আগে টের পায়নি। এসব বিষয় নিয়ে ইমামের সাথে তার যত বেশি কথা হচ্ছে ততই যেন সে গভীরে প্রবেশ করছে। লামিয়ার বিচ্ছেদবেদনার উপশম খুঁজতে গিয়ে এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিকতার সন্ধান যেন সে পেয়ে গেছে। রুশো তার কিছু কিছু গানকে বলে আধ্যাত্মিক গান। দুর্বোধ্য সে সব সুফি গান বুঝতে হলে নাকি গাঁজা খেতে হয়। মস্তিষ্কে ঘোর তৈরি করে তারপর কথাগুলো নিয়ে ভাবতে হয়। ওমার চেষ্টা করেছে, সে সব ভাবনায় শুধু জট লেগে যায়। অনেকক্ষণ ভাবার পরও কোনো কূলকিনারা করতে পারে না। রুশো বলে এই আধ্যাত্মিকতা অ্যাবস্ট্রাক

বা বিমূর্ত ছবির মতো। নির্দিষ্ট কোনো অর্থ থাকে না, একেক জনের ভাবনা অনুযায়ী একেক রকম অর্থ দাঁড়ায়। এটাই নাকি আধ্যাত্মিক বা সুফি গানের রহস্য। অন্যদিকে ইমাম যা বলেন স্পষ্ট করে বলেন। কোনো রাখঢাক রেখে তিনি কিছু বলেন না। তিনি বলেন, বিষয় সহজ-সরল না হলে বুঝ তৈরি হয় না। আর বুঝ না হলে বিশ্বাস তৈরি হয় না। বুঝের পর যে বিশ্বাসটা তৈরি হয় তার নাম ইমান।

গভীর রাতের নীরবতাকে আরও গভীর করে মায়ের পরিচিত পায়ের আওয়াজটা এগিয়ে আসছে ওমারের রুমের দিকে। ওমার সারারাত অপেক্ষায় ছিল এই আওয়াজটার জন্য। অন্যদিনের মতো ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও আজ সে বিছানায় বসে আছে। মা এসে বিছানায় ওমারের পাশে বসলেন। মায়ের হাতে একটা প্যাকেট।

'তোর জন্য একটা গিফট এনেছি।'

হাসতে হাসতে ওমার বলে—

'মা আজ তো আমার জন্মদিন না।'

মায়ের চোখে-মুখে হাসির দ্যুতি, মা তার তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করে এসেছেন।

'জন্মদিন না হলেও আজ একটা বিশেষ দিন।'

ওমার তার ভ্রু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলে, 'কীসের বিশেষ দিন মা?'

'তোকে এই উপহারটা দিচ্ছি তাই বিশেষ দিন।'

ওমার খুশিতে ছোট্টবেলার মতো মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কতদিন পর সে মাকে এভাবে ধরল। মায়ের গায়ে সেই চির চেনা মা মা গন্ধ। লামিয়া তার জীবনে আসার পর সে অনেক কিছু থেকে ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। লামিয়ার প্রতি তার প্রবল প্রেম পৃথিবীর সবকিছু থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে ফেলেছিল। শেষ কবে মাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেছিল তার মনে নেই। ওমারের খুব কান্না পাচ্ছে, কিন্তু সে তার কান্নাটাকে কোনোভাবেই মাকে দেখতে দিতে চায় না, চায় না মায়ের মনটা খারাপ করে দিতে। মাকে আরও বেশি করে বুকে চেপে ধরে কান্নাটা লুকায় ওমার। মা ওমারের মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় আর বিড়বিড় করে দোয়াদরুদ পড়তে থাকে।

করই গাছের দোয়েলগুলো ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। মাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে মনে হচ্ছে এই শেষ রাতের পবিত্র পৃথিবীটা যেন ওমারের বুক ভাঙা সব রক্তক্ষরণ শুষে নিচ্ছে। ওমারের বুকের ভেতর থেকে মা বলেন—

'উপহারটা দেখবি না।'

মাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি করে ওমার প্যাকেটটা খোলে, একটা সবুজ জায়নামাজ।

ওমার অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা কীভাবে সম্ভব! মা ওমারের বিস্মিত চেহারা দেখে বলেন,

'কিরে এত অবাক হচ্ছিস কেন, হজ্বের বছর এটা আমি মদিনা থেকে কিনেছিলাম, যখন তোর বউ হবে তখন তাকে দেব বলে। আজই কেন যেন হঠাৎ মনে হলো, আমি যদি এটা তোকে না দিয়েই মরে যাই। তাই ভাবলাম আজই তোকে দিয়ে দেই।'

ওমারের বিস্ময় অন্য জায়গায়।

কী যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি ওমারকে সারারাত অস্থির করে রেখেছিল। এটা ঠিক যে সেটা লামিয়ার জন্য ছিল না। একবার তার মনে হয়েছিল সে রুশোর কাছে চলে যাবে। রুশো সারারাত জেগে থাকে, নিশ্চয়ই এখন জেগে আছে। এই অবস্থায় রুশোর কাছে গেলে সে তাকে পিনিক ধরিয়ে দেবে তারপর বসে বসে বাকি রাত তার সাইক্যাডেলিক কম্পোজিশন শুনতে হবে, কিন্তু সে সবে তার কোনো আগ্রহ হচ্ছে না। হঠাৎ করেই তার তখন ইমামের কথা মনে পড়েছিল। ওমার ইমামের রুমে বসে থাকা অবস্থায় এক বিপদগ্রস্ত লোক যিনি ব্যবসায় মার খেয়েছিল সে সব কথা শেষে বলেছিলেন,

'হুজুর আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলে, কী করি।'

ইমাম মজা করে বলেছিলেন, 'ওজু কর'।

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেছিল, 'ব্যাস, ওজু করলেই হবে?'

ইমাম বলেছিলেন 'পানি দিয়েই তো আগুন নেভে, নাকি!'

এই অস্থিরতার রাতে ওমারের মনে হয়েছে সেদিন ইমাম কথাটা সেই লোকটিকে বললেও এখন তার মনে হচ্ছে কথাটা তার উদ্দেশ্যেই বলা। সেটা মনে হতেই ওমার বাথরুমে ঢুকে পড়েছে ওজু করার জন্য।

ওজু করতে করতেই তার মনে এক ধরনের প্রশান্তি খেলে যাচ্ছিল। বিষয়টিকে ওমার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিল। যেহেতু সে ইমামকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে তাই হয়তো তার মনে সেটার প্রভাব কাজ করছে ফলে ওজু তাকে এই প্রশান্তিটা দিচ্ছে। দীর্ঘ সময় নিয়ে ওমার ওজু করে। গত কয়েক বছরে ঈদের নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজ পড়েছে বলে তার মনে পড়ে না। ইমামের সাথে তার এখন কত কথা হয় অথচ ইমাম তাকে কখনো নামাজ পড়ার কথা বলেন না। কথার মাঝখানে নামাজের সময় হলে তিনি শুধু বলেন, 'আমি আমার বন্ধুর সাথে দেখা করে আসি।'

এরপর ওমার চুপচাপ ইমামের রুমে বসে থেকেছে অথবা বাইর থেকে সেই সময়টুকু ঘুরে এসেছে। ইমামের এই বিষয়টা ওমারকে মুগ্ধ করেছে। ইমাম ইচ্ছের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন যার ইচ্ছে গ্রহণ করবে যার ইচ্ছে গ্রহণ করবে না। এসবে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। ওমার এটা ভাবতে ভাবতে ওজু

করছে, আর ওজুর মাঝেই সিদ্ধান্ত নেয়, আজ সে মায়ের পাশে বসে ফজরের নামাজ পড়বে। আর আজই মা তার জন্য জায়নামাজ নিয়ে এলেন। ওমারের বিস্ময় তখনো কাটেনি। সে অবস্থায় সে তার মাকে সবটা খুলে বলল। মা মিষ্টি হেসে বললেন, 'ব্যাখ্যা করে সব রহস্যের জট খোলা যায় না বাবা। অপেক্ষা কর নিজেই টের পাবি।'

সারা শহরকে জাগিয়ে দিয়ে বাইরে তখন ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে। মা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান। ওমার বলে—

'মা আমি তোমার পাশে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ি।'

মা বললেন আমি পাশে থাকলে তোর নামাজে ধ্যান আসবে না বাবা, তুই একা একা পড়।'

আসরের নামাজ শেষ করে ধীরস্থিরভাবে মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসলেন ইমাম ইসহাক। মুনাজাতের আগে এখন কিছুক্ষণ তিনি তসবিহ—তাহলিল যিকির করবেন। আঙুলের কর গুনতে গুনতে সামনে তাকাতেই ওনার চোখ পড়ল দ্বিতীয় সারির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছে ওমার। ইমামের দিকে চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল। ওমারকে দেখে মুগ্ধ ইমাম মহান আল্লাহর প্রসংসা করলেন। খুশিতে চকচক করছে ইমামের চোখ। তিনি অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ জিকির সংক্ষিপ্ত করলেন এবং দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। ওমার যেদিন এসে ইমামকে বলেছিল তাকে বন্ধু করে নেওয়ার জন্য সেইদিন তার গভীর রাতের প্রার্থনায় আল্লাহার কাছে দোয়া করে বলেছিলেন 'আল্লাহ আমি তাকে বন্ধু করে নিয়েছি, এবার তুমি তাকে বন্ধু করে নাও।' ওমার আজ নিজে থেকেই বন্ধুর ঘরে হাজির হয়েছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন কৃতজ্ঞতায় ইমামের দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। তার দুচোখের নীরব পানির ধারা গড়িয়ে মিশে যায় তার কাশফুলের মতো শুভ্র দাড়িতে। মোনাজাতের জন্য মসজিদের আসরের জামাতের এক তৃতীয়াংশ লোক অপেক্ষায় ছিল, সবাই হাত তুলে মুনাজাতে মসগুল। কিন্তু ওমার দু'হাত তুলে তীক্ষ্ণ চোখে ইমামকে খেয়াল করছে, ইমামের নীরব কান্নাটা ওমার দেখে ফেলেছে। এই দোয়া এই শেষ বিকেলের নীরব কান্না ওমারের ব্যথিত হৃদয়কে ছুঁয়ে যাচ্ছে, তার কেন যেন মনে হচ্ছে সে আছে এখন ইমামের প্রার্থনা জুড়ে। শেষ বয়সি ইমামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় ভরে উঠেছে ওমারের বুক। ইমাম মোনাজাত শেষ করলেন। একে একে মুসল্লিরা সবাই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। সবাই চলে গেলে ইমাম আরও কিছু সময় বসে থাকলেন, সারা মসজিদে এখন শুধু ওমার আর ইমাম। ইমাম উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই ওমার ছুটে এসে তার হাত ধরল, সস্নেহে মিষ্টি হেসে তিনি ওমারের বলিষ্ঠ কাঁধে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক হাত ওমারের

কাঁধে অন্য হাতে লাঠি ঠুকে ঠুকে তারা ইমামের রুমে প্রবেশ করল। ইমামকে চেয়ারে বসতে সাহায্য করে ওমার সামনের চেয়ারে বসল।

ওমার হালকা মজা করে ইমামকে বলল,

'মনে হচ্ছে আজ অফিসিয়ালী আমার বন্ধুত্বটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে।'

ইমাম মুচকি হেসে বললেন,

'কীভাবে মনে হলো।'

'যে দোয়া কবুল হয় সে দোয়া প্রার্থনাকারীকে স্পর্শ করে।'

এই সমস্ত কথার কারণে এই ছেলেটাকে ইমামের অসাধারণ মনে হয়। ইমাম পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

'সেই স্পর্শটা কেমন?'

'আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। এক বর্ষায় গিয়েছিলাম দাদার বাড়ি নাটোরে। আমাদের বাড়িতে প্রতি বৃহস্পতিবার দাদির কাছে কিছু দরিদ্র মহিলা আসত সাহায্য নিতে। সেই মহিলারা সেদিন আসার পর বৃষ্টির কারণে আটকা পড়ে গিয়েছিল। দুপুর থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আর থামার কোনো নাম ছিল না। সেই মহিলারা বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তখনো বৃষ্টি থামে না, অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ভিজতে ভিজতেই বাড়ির পথে রওনা দেয়, শুধু একজন ছাড়া। তিনি বয়সে প্রায় আশি বছরের মতো হবেন, কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটেন, তার উপর চোখে খুবই কম দেখেন। ভালোমতো খেতে পারত না বলে শরীর বলতে ছিল কয়খানা মাত্র হাড়। ঠিক সন্ধ্যার আগ দিয়ে বৃষ্টি থামে। দীর্ঘ বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে যে পথটা দিয়ে তিনি এসেছিলেন সে পথটা এক বুক পানিতে মূল সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন মূল সড়কে উঠতে হলে তাকে অন্যপথে ঘুরে যেতে হবে, সেটা অনেক দূরের পথ। তার ওপর দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৃদ্ধা অসহায় হয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের ভিটায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক তখন কী একটা কারণে যেন সেখানে গিয়েছিলাম। বৃদ্ধাকে দেখে খুব মায়া হলো, জিজ্ঞেস করলাম—

'কী হয়েছে দাদি?'

আমরা ছোটবেলায় যেকোনো বৃদ্ধা মহিলাকেই দাদি বলে ডাকতাম।

তিনি খুব কাতর কণ্ঠে আমাকে তার অসহায়ত্বের কথা জানালেন। আর বললেন তাড়াতাড়ি না গেলে অন্ধকার হয়ে গেলে তিনি আর চোখে কিছু দেখবেন না। আমার যেন তখন কী একটা হয়ে গেল। আমি কোনো কিছু চিন্তা না করেই বৃদ্ধাকে আমার দুই হাতে তুলে নিলাম। চড়ুই পাখির মতো একটা শরীর। আমার কাছে কোনো ওজনই মনে হয়নি। আমি কোলে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধা খিলখিল করে শিশুর মতো হাসতে হাসতে বলে—

'ও নাতি কী কর, ও নাতি কী কর।'

আমি তাকে কোলে নিয়ে নেমে পড়লাম পানিতে। সে দৃশ্য দেখে আশপাশ থেকে সবাই হাসাহাসি শুরু করেছে। আমি যতই এগোতে থাকি ধীরে ধীরে পানির গভীরতা ততই বাড়তে থাকে আর আমি তাকে যথাসম্ভব হাতের উঁচুতে তুলতে থাকি। এভাবে বুক সমান পানি ভেঙে, এক ফোঁটা ভিজতে না দিয়ে তাকে মুল সড়কের ওপর এনে আস্তে করে কোল থেকে নামাই। তাকে নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরতি পথে যেই কয়েক কদম এগিয়েছি তখন পেছন থেকে বৃদ্ধা আমাকে ডাক দিলেন—

'ও নাতি।'

আমি ঘুরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তখন আমার মাথাটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম, তিনি কোনো কথা না বলে আমার মাথা আর সারা গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর বিড়বিড় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন। এতকিছু বোঝার মতো বয়স আমার তখন ছিল না, তার সেই স্পর্শ আমাকে তখন এই অনুভূতি দিয়েছিল যে এটা দোয়া কবুলের স্পর্শ। কী যে কোমল আর শীতল ছিল সেই স্পর্শ, আমি তেমন হাতের স্পর্শ আর কোনোদিন পাইনি।' ওমার কিছুক্ষণ থেমে, মাথা নিচু করে বলে, 'কিন্তু আজ আসরের পর মসজিদে আপনি যে দোয়া করেছেন, আমার মনে হয়েছে আপনি যেন আমার জন্য দোয়া করছেন, আমি সেই বৃদ্ধার স্পর্শটা হঠাৎ করে ফিল করতে পারছিলাম। আর আমার মনে হচ্ছিল আপনার প্রতিটি প্রার্থনার জবাব দেওয়া হচ্ছে।'

'তুই শেষ পর্যন্ত বদলেই গেলি।'

'বাঁচার জন্য আমার মাত্র দুইটি পথই খোলা ছিল।'

'কী সেটা?'

'নিজেকে বদলে ফেলা অথবা আত্মহত্যা করা। আমার আগের পুরো আমিটাই ছিল লামিয়ার, সেই আমিটাকে আর বহন করতে পারছিলাম না। সেই আমিটাকে মেরে ফেলা অথবা নিজেকে বদলে ফেলা ছাড়া আর কিবা করার ছিল, বল?'

'তাই বলে ধর্মে?'

'আমি তো প্রথমে তোর মতোই হতে চেয়েছিলাম। একদম তোর মতো। এত চেষ্টা করলাম পারলাম কই। এটা তোর ব্যর্থতা। তুই আমাকে তোর মতো বানাতে পারলি না।'

'তুই আমাকে বুঝতে পারিসনি।'

'হ্যাঁ পারিনি, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে ড্রাগ ছাড়া তোকে বোঝা সম্ভব না। আর সেটাও ট্রাই করেছি, কিন্তু কেন যেন ড্রাগ আমাকে পুরা মজা দিতে পারেনি।'

'তোর আরও ট্রাই করা উচিত ছিল।'

'তা হলে তো ড্রাগ আমাকে খেয়ে ফেলত, আমি ড্রাগের দাস হয়ে যেতাম।'

'কই আমি কি ড্রাগস্-এর দাস হয়েছি? আমি ড্রাগসকে কাজে লাগাই, আমি ড্রাগ খেয়ে সৃষ্টি করি, আমার নেশা থেকে শিল্প তৈরি হয়।'

'এইজন্য সেটা রিয়েলিস্টিক না অ্যাবস্ট্রাক, সহজে বোঝা যায় না, তোকে বা তোর শিল্পকে যতটুকু বুঝেছি সেটা ড্রাগস্ নিয়েই বুঝেছি।'

'ধর্মের মধ্যে কি খুঁজে পেলি বল তো।'

'খুব সিম্পলি একটা জিনিস পেয়েছি দ্যাট ইজ 'পারপাস অব লাইফ'। লামিয়া ছাড়া আমার জীবনে যেন আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কেমন ভুলের মধ্যে ডুবে ছিলাম চিন্তা কর। এখন বুঝি লামিয়া ছিল আমার আসক্তি, প্রেম সেটার ভুল অর্থ। এমন আসক্তি তোরও আছে, সেটা অন্য কিছু। বেশিরভাগ মানুষই কোনো না কোনো বস্তুর প্রতি আসক্ত। এই আসক্তি তাকে ভুলিয়ে দেয় পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করে তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যটা কী?'

'কী?'

'প্রেম'

এটা শুনে হা হা করে হেসে ওঠে রুশো।

'সে তো ঘুরেফিরে একই কথা।'

ওমার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—

'না, একই কথা না,

এই প্রেম স্রষ্টাকে ভালোবেসে তার জন্য তার সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে ভালোবাসা। আমি সেই প্রেমে পড়েছি। বিশ্বাস কর এখন আমার একটা মাছি, তেলাপোকা, পিঁপড়ের প্রতিও মায়া আর প্রেম তৈরি হয়েছে। লামিয়ার প্রতি প্রেম আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। সেই অন্ধপ্রেম ধরে রাখলে মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

এখন বুঝি মানুষ প্রেমে কষ্ট পেলে কেন আত্মহত্যা করে। কারণ তার নিজের তৈরি করা আসক্তি তাকে কষ্ট দেয়। তার নিজের তৈরি করা আসক্তির কারাগারে সে বন্দি থাকে। সেই আসক্তির প্রেম তাকে এমন অন্ধ বানিয়ে রাখে যে তার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, সে মুক্তির আর কোনো পথ খুঁজে পায় না, তখন সেই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সে আত্মহত্যা করে। তোর কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি এনায়েতের পরিবাগের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এসে একটা জায়গা আর উপায় খোঁজা শুরু করেছিলাম সুইসাইড করার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম তেজগাঁ'র দিকে। রেললাইন ধরে হাঁটছি, আর মনে মনে আশা করছি কোনো ট্রেন এসে আমাকে পেছন থেকে পিষে দিয়ে চলে যাবে। এভাবে উদভ্রান্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে আমার চোখ পড়ল রেললাইনের পাশের বস্তির ঘুপরী ঘরের পাশে একটা মাজা ভাঙা কুকুর দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। অবস্থা দেখে মনে হলো কুকুরটা সেভাবে অনেক দিন ধরে ওখানে পড়ে আছে, খাওয়া পায় না বলে হাড্ডি বের হয়ে আছে, গায়ের লোম উঠে গেছে। হঠাৎ মনে হলো মরার আগে একটা ভালো কাজ করি, এই কুকুরটাকে একটু ভালোবাসা দিয়ে যাই। একটা টং দোকান থেকে এক প্যাকেট রুটি কিনে প্যাকেট ছিঁড়ে তার দিকে রুটিটা ছুড়ে দিলাম। রুটিটা তার নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়ল কিন্তু কুকুরটার তাতে কোনো ভ্রক্ষেপ দেখলাম না। আমার হাতে অত সময় নেই। প্রথম ট্রেনটাতেই কাজ সারতে হবে। আমি আবার হাঁটা শুরু করলাম, অপেক্ষা করছি সামনে অথবা পেছন থেকে কোনো ট্রেন চলে আসবে। কিছু দূর এগোনোর পর আমার হঠাৎ মনে হলো, কুকুরটাকে যে পরিমাণে ক্ষুধার্ত মনে হলো তাতে রুটি পাওয়ার সাথে সাথে রুটির ওপরে তার ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ছিল, সেটা করল না কেন! আমি আবার ফিরে এলাম কুকুরটার কাছে। এসে দেখি রুটিটা সেভাবেই পড়ে আছে, খায়নি। ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমি কুকুরটার কাছে গিয়ে বসলাম। দেখি তার চোখটা ঘোলা, অর্থাৎ কুকুরটা চোখে দেখে না। এটা দেখার পর তার ওপর আমার মায়াটা আরও বেড়ে গেল। আমি পাউরুটিটা ছিড়ে টুকরো করে তার মুখের সাথে লাগালাম, কুকুরটা ধিরস্থিরভাবে আমার হাত থেকে রুটিটা নিয়ে খেল। এভাবে ছোট ছোট টুকরো করে আমি তার মুখের সাথে লাগাই আর সে

খায়। এই খাওয়াতে খাওয়াতেই প্রথম ট্রেনটা চলে গেল। দানবের মতো শব্দ তুলে চলে যাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার তখন মনে হলো আমি খাবার দিয়ে কুকুরটার জীবন বাঁচালাম না, বরং খাবার খেয়ে কুকুরটাই যেন আমার জীবনটা বাঁচাল।

এরপর কুকুরটাকে পানি খাওয়ালাম। কুকুরটা কৃতজ্ঞতায় আমার পায়ের সাথে তার মাথা ঘষতে চাইল। আমি তার পাশে বসে পড়লাম। নোংরা চামড়া ওঠা কুকুরটাকে আমি একটুও ঘৃণা করিনি। কুকুরটা কুইকুই করে আমার পায়ে তার মাথা ঘসল, আমি তার মাথায় আর গলায় হাত বুলিয়ে দিলাম। লামিয়ার জন্য আমি মরতে গিয়েছিলাম, আমাকে বাঁচিয়েছিল একটা কুকুর। সেদিন বুঝেছিলাম আমার বেঁচে থাকাটা এই পৃথিবীর অনেকের প্রয়োজন। কোথাও না কোথাও একটা ফুল, একটা পাখি, একটা ঘাসফড়িং আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমাকে তাদের সবার কাছে যেতে হবে।'

ওমারের কথাগুলো বলা শেষ হলে নীরবতা নেমে আসে ওদের দুজনের মাঝে। জনির বাইক নিয়ে আজ রুশো বের হয়েছিল, ওমারকে তুলে নিয়েছিল তার বাসা থেকে। বলেছে তাকে আজ একটা অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে যাবে। সারপ্রাইজ দেবে বলে আগে থেকে কিছু বলেনি। ওকে নিয়ে এসেছে নতুন জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়ের পাশে। প্লেন ওঠা-নামার সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় অসম্ভব নীরব জায়গাটা। নতুন উপশহর উত্তরার পাশে এই সুন্দর জায়গাটার খোঁজ ওদের বন্ধুরা এখনও পায়নি। এমনিতেই জায়গাটা নীরব তার ওপর ওমারের এতক্ষণের কথা শুনে রুশো স্তব্ধ হয়ে গেছে। এতক্ষণ ওমারের মুখোমুখি ঘাসের ওপর বসে ছিল। নীরবতা ভেঙে উঠে দাঁড়াল রুশো। ওমারকে ইশারায় উঠতে বলল। ওমার দাঁড়ালে, রুশো তাকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল। তারপর আলিঙ্গন ছেড়ে বলল—

'বিশ্বাস তোর যাই থাকুক, তুই আমার সারাজীবনের বন্ধু, লিভ ইওর লাইফ ম্যান।'

ওমারের জীবন থেকে লামিয়া চলে গেছে আজ দেড় বছর হলো। ওমার এখন এক বদলে যাওয়া মানুষ। পুরা একটা ইয়ার লস দিয়ে আবার ক্লাস শুরু করেছে। আগে যেভাবে ওমারের সাথে লামিয়া ঘুরতো এখন ঠিক সেভাবেই এনায়েতের সাথে ঘোরে। সে দৃশ্য ইউনিভার্সিটির অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন জন্ম দিলেও এনায়েতের ভয়ে কেউ একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া আর এক মুহূর্ত ওমার ইউনিভার্সিটি এলাকায় থাকে না। লেকের ধারের বটগাছের নিচে ওমার আগের মতোই বন্ধুদের সাথে বসে, শুধু মাগরিব আর এশার আজান শুরু হলে সে সেখান থেকে উঠে চলে যায় লেকের ওপারের মসজিদে। ওমারের ব্যক্তিত্বে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, আগের মতো হইহুল্লোড় আর উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ধীরস্থির হয়েছে, খুব কম কথা বলে, কী যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে। বন্ধুরা ওমারের অবস্থাটা বোঝে। তারা সেই বিষয় নিয়ে ওমারকে ঘাটায় না। প্রথম দিকে কেউ কেউ তার সাথে লামিয়াকে নিয়ে মজা আর ইয়ার্কি করত, সে সব ওমারকে আরও শামুকের মতো গুটিয়ে দিত। রুশো সবাইকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ যেন ওমারের এই বিষয়টা নিয়ে কোনো রকম কথা না বলে। যতদিন যাচ্ছে লামিয়ার সাথে বিচ্ছেদটা ওমারের কাছে আশীর্বাদের মতো মনে হচ্ছে। ওমারের কাছে লামিয়াই ছিল পৃথিবী, অথচ তার বিচ্ছেদ তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে পৃথিবীর সবকিছুকেই ভালোবাসতে হবে যেমন করে সে লামিয়াকে ভালোবেসেছে। পৃথিবীর মাটি পানি, বায়ু, আলোর ভোগটা যেমন সবার জন্য, তেমনি এর বিনিময়ে ভালোবাসাটাও হতে হবে সবার জন্য। এক চোখা ভালোবাসা তাকে কত কী থেকে এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছিল। পূর্ণ চোখ মেলে কত কী তার দেখা হয়নি। ইমাম তার অন্য চোখটিও খুলে দিয়েছেন। ইমাম বলেন, 'জ্ঞান হলো আলো। আবার সব আলোও আলো নয়, কোনো কোনো আলো গভীর অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকার। সে অন্ধকার আলোর ভিতরেই লুকিয়ে থাকে।'

ওমার জিজ্ঞেস করে-

'সেটা কেমন?'

ইমাম বলেন—

'তোমাকে যে জঙ্গলের গল্প বলেছিলাম সেটাই আবার বলছি—

তুমি অন্ধকার রাতে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছ এবার তোমার হাতে কোনো আলো নেই, জঙ্গলের একটি প্রান্তে এসে তুমি দেখলে দুটি পথ দুই দিকে চলে

গেছে। সেই দুটি পথে দুজন লোক মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে পথ দেখানোর জন্য।

দুজনার হাতেই আলো এখন তুমি কোন আলোর পথে যাবে?

সেই দুজন লোকের একজন ডাকাত অন্যজন আউলিয়া। দুজনের হাতেই আলো, দুটো আলোই তোমাকে পথ দেখাবে, তুমি জানো না সেই দুটি লোকের মধ্যে কার মতলব কী?

কে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। আরও সমস্যা আছে, ডাকাতের বেশভূষা, স্বভাব সবকিছুই সাধুর মতো। ভালোমানুষীর সবকিছুই সে ধারণ করে আছে, মিষ্টি কথা আর উত্তম আচরণ তোমাকে মুগ্ধ করে দেবে নিশ্চিত। অন্যদিকে আউলিয়া নিজের স্বভাবেই আছেন। বাড়তি কোনো কিছু নেই, নেই কোনো আলগা চাকচিক্য।

তুমি মরিয়া হয়ে পথ খোঁজা পথিক, এবার বলো তুমি কাকে বেছে নেবে?'

উত্তর জানার জন্য ওমারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ইমাম।

বেশ সময় নিয়ে ওমার চিন্তা করে উত্তর দিল—

'একটা সৌভাগ্যের পথ অন্যটা দুর্ভাগ্যের। আমার মনে হয় এখানে তাকদির একটা ফ্যাক্টর। ডাকাতের চাকচিক্য দেখে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

ইমাম বলেন—

'হ্যাঁ, তুমি সৌভাগ্যবান হলে আউলিয়ার পথ ধরে চলে যাবে, তবে দ্বিতীয় পথটা দুর্ভাগ্যের হলেও সেখান থেকে তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।'

ওমার জিজ্ঞেস করে,

'দুর্ভাগ্য থেকেও জ্ঞান হয়?'

ইমাম মিষ্টি হেসে বললেন—

'হবে না কেন! নইলে তুমি কীভাবে জানতে ডাকাতের হাতেও আলোর মশাল থাকে। যে আলো তোমাকে নিয়ে যাবে অন্ধকারের দিকে। তুমি যত বেশি অন্ধকারকে চিনবে, আলো তত বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে। তুমি যখন অন্ধকারের আসল রূপটা চিনে যাবে তখন তোমাকে আর কোনোভাবেই অন্ধকারে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। এই অন্ধকারকেই বলে কুফর। কুফর অর্থ যা সত্যকে ঢেকে রাখে। এই যুগে কাফের হলো সেই ডাকাত যার আলোর ভেতরেই লুকিয়ে আছে অন্ধকার।'

ওমার এখন গভীর রাতে মায়ের পাশে বসে তাহাজ্জুদ পড়ে। অনেক সময় মা নামাজ শেষ করে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে ওমারের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ওমারের নামাজ পড়া দেখেন আর আনন্দে তার চোখ ভিজে ওঠে। তার এই ছেলেটা অন্য ছেলেদের

চেয়ে আলাদা হয়েছে। ছেলের হৃদয় ভাঙার কষ্টটা তিনিও তিল তিল করে অনুভব করেছেন। আল্লাহর কাছে তার জন্য হৃদয় উজাড় করে দোয়া করেছেন, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন কষ্ট কীভাবে ওমারকে বিপদগামী করে ফেলছিল। ড্রাগ অ্যাডিকশনের শেষ প্রান্ত থেকে ওমার ফিরে এসেছে। তার দোয়া আর ইমাম ইসহাকের দাওয়া এই দুই মিলে ওমারকে নিশ্চিত গভীর খাদের পতন থেকে ফিরিয়ে এনেছে। ওমার বুদ্ধিদীপ্ত এবং মেধাবী। ভাসা ভাসা অথবা অন্ধবিশ্বাসের কথা দিয়ে তার মতো ছেলেকে বোঝানো সম্ভব নয়। যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস ছাড়া ওমারকে বোঝানো সম্ভব না। মা নিজে সেটা পারতেন না বলেই তাকে ইমাম ইসহাকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ওমারের বাবা ইমাম ইসহাকের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অনেক দিন আগে ওমারের মাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইমামের দোয়া নিতে। সেদিন ইমাম ওমারের বাবাকে বলেছিলেন,

'বলো তো পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?'

ওমারের বাবা এই উত্তরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিভিন্ন কথা বলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি পার্থিব উপায় উপকরণ অর্জনের দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সফলতার মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছিলেন।

ইমাম মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—

'নাহ্, পুরুষের সফল আর শ্রেষ্ঠ হতে এত কিছু লাগে না, যে পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে শ্রেষ্ঠ, সে-ই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।'

আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'শুধুমাত্র সম্মানিত লোকরাই নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে, আর যারা অসম্মানিত, নারীদের প্রতি তাদের আচরণও হয় অসম্মানিত।'

সেদিনের সেই ছোট্ট কথাটুকু ওমারের বাবার মনোজগৎ বদলে দিয়েছিল। সেদিনের পর থেকে আর কখনই তিনি কটুকথা বা খারাপ আচরণ করেননি। মাঝে মাঝে ওমারের মাকে মজা করে বলতেন—

'তুমি সার্টিফিকেট না দিলে তো আমি ধরা, আমি তোমার সাথে উত্তম আচরণ করছি তো, নাকি?'

ইমাম ইসহাকের উপদেশের শক্তি ওমারের মা সেদিন টের পেয়েছিলেন। বিপদে-আপদে তাকে দোয়া করতে বলতেন। ওমারের এই দুঃসময়ে তাই তিনি তাকে ইমামের কাছে যেতে বলেছিলেন।

'মানুষ তার সাথে করে একটা চিড়িয়াখানা নিয়ে ঘোরে। তার প্রয়োজন অনুসারে সে একটা করে প্রাণীকে প্রদর্শন করে অথবা কাজে লাগায়। কখনো সে বাঘ কখনো সে হায়না, কখনো সে গরু-ঘোড়া অথবা গাধা, কখনো সে বিষাক্ত সাপ। মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ সে এই চিড়িয়াখানাটা সামলাতে ব্যস্ত থাকে। চিড়িয়াখানা সামলানোর এই ব্যবস্থাপনা যার যত ভালো সে তত ভালো মানুষ। খারাপ

মানুষেরা আসলে তাদের চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনায় খারাপ, আর বেশি খারাপ যারা তারা তাদের চিড়িয়াখানার সকল প্রাণীর দরজা খুলে রাখে। তার সে সব ক্ষুধার্ত আর হিংস্র প্রাণীরা মানুষ, সমাজ আর রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন, এখনও তাকে জীব-জন্তুর সাথে লড়াই করতে হয়। সে লড়াইয়ে যে হেরে যায় তাকে আমরা বলি অসভ্য বা ইতর। মানুষের এ লড়াই ইতরপ্রাণী আর অসভ্যতা থেকে মূলত সভ্য হওয়ার লড়াই। নিজের ভেতরে লড়াই। নিজের পশুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই। ইসলাম এটাকে বলে নাফসের বিরুদ্ধে লড়াই। এটা বড় লড়াই। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করাটাকে বলা হয়েছে ছোট লড়াই। বোঝ এটা কত গুরুত্বপূর্ণ লড়াই!

গত দুশো বছর যতগুলো লড়াই হয়েছে তার বেশিরভাগই হয়েছে জাতিয়তাবাদী লড়াই। এক জাতি আরেক জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুট করেছে তাদের সম্পদ, দখল করেছে জমি, হত্যা ও নির্যাতন করেছে, পদানত করে শাসন করেছে। নেকড়েরা যখন আক্রমণ করে তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে, কোনো নেকড়েকে একা একা আক্রমণ করতে দেখবে না। উপনিবেশিক ইউরোপিয়ান জাতিগুলো নেকড়ের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে বাদবাকি বিশ্বকে লুণ্ঠন করেছে। নাফস শুধু ব্যক্তি না এটা গোত্র-জাতি এমনকি রাষ্ট্রের আকারেও অসভ্যতা করে। ইসলাম কায়েম হয়েছে মানুষের চরিত্রের ওপর। যাতে করে সে তার বিশ্বাস দিয়ে তার পশু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এ লড়াই ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত।'

এই পর্যন্ত বলে ইমাম থামলেন।

ওমার জিজ্ঞেস করল,

'প্রবৃত্তির বিরুদ্ধের লড়াই কি রাষ্ট্র পর্যন্ত টেনে নেওয়া সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়, ব্যক্তি শুদ্ধ হলে সমাজ শুদ্ধ হবে, সেই শুদ্ধ ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র, তৈরি করলে সেটা হবে- কল্যাণ রাষ্ট্র। তেমন কল্যাণ রাষ্ট্র তার নাগরিকের জন্য যেমন উপকারী তেমনি বাদবাকি পৃথিবীর জন্যও উপকারী।'

এশার নামাজের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে এসব আলোচনা। ইসলামের এমন রাষ্ট্র চিন্তা, এমন আধুনিক চিন্তা ওমারকে চমৎকৃত করে। ওমার বলে—

'ধর্ম বলতে এতদিন সে যা জেনেছে ধর্ম কি তেমন না?'

ইমাম বলেন, 'তোমার ধর্ম তো ধর্মই না।'

'তা হলে কী?'

'ধর্মের ইংরেজি শব্দ হলো রিলিজিয়ন। আর রিলিজিয়ন বা ধর্মের আরবি শব্দ 'মাজহাব'।

কোরআনে ইসলামকে বলা হয়েছে দ্বীন। দ্বীনের খুব সাধারণ অনুবাদ করা হয়েছে ধর্ম বা রিলিজিয়ন নামে। এটা ঠিক নয়। দ্বীনের অর্থ ব্যাপক। দ্বীনকে

আইডিওলজি শব্দ দ্বারা অনুবাদ করলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন ক্যাপিটালিজম এবং কমুনিজম দুটি আইডিওলজি। অন্য অর্থে এই দুটি দ্বীন। এই দুটিতে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রায় সকল বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে। তেমনি ইসলামেও ব্যক্তি, সমাজ রাষ্ট্র বিষয়ে করণীয় প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা রয়েছে। পার্থক্য হলো ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ আর কমুনিজম বা সাম্যবাদ মানুষের তৈরি, অন্যদিকে ইসলাম মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর তৈরি। ইসলামকে ধর্ম বললে এর ব্যাপকতাকে সংকোচিত করা হয়। আমাদেরকে এসব বুঝতে হয়েছে, কারণ আমরা বড় হয়েছি যে পৃথিবীতে সেখানে প্রভাব বিস্তারের জন্য পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদ দুই আইডিওলজি মরণপন লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। সে লড়াইকে কমিউনিস্টরা বলত শ্রেণি সংগ্রাম, তার ওপরে ওরা ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করত। তাই আমরা আমাদের বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করার জন্য আর এইসব আইডিওলজির বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকে প্রচুর ইনটেলেকচুয়াল ডিবেট করতে হয়েছিল। সে সব ডিবেটে আমাদের অনেক উপকার হয়েছিল। আমাদের ইমান বা বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়েছিল। আমরা বুঝেছিলাম ইসলাম কোনো অন্ধবিশ্বাস নয়, এটা যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস। স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি নেই এমন প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর না পেলে তোমার ইমান বা বিশ্বাস শক্তিশালী হবে কীভাবে। অন্ধবিশ্বাস অল্প দিনেই ভেঙে যায়। আমার বিশ্বাসটা যদি অন্ধ হতো তা হলে সারাটা জীবন ধরে এই একই বিশ্বাসের ওপর টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

আমি অনেকটা তোমার মতোই ছিলাম, সবকিছুতেই প্রশ্ন করতাম। ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্র বিষয়ে এমন সব প্রশ্ন করতাম যাতে আমার সহপাঠীরা এমনকি আমার শিক্ষকদের কেউ কেউ বিরক্ত হতেন। যতক্ষণ উত্তর পেতাম না ততক্ষণ আমি প্রশ্ন করতেই থাকতাম। আমার প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমি ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আলেম ওলামার দারস-এ অংশ নিয়েছি। আমার এসব আগ্রহ দেখে খুব খুশি হতেন আমার দারুল উলুম দেওবন্দের ওস্তাদ মাওলানা আব্দুস সোবহান সিন্ধী। দেওবন্দ পর্ব শেষ হবার পর আমার ওস্তাদের সুপারিশে আলিগড় মুসিলম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী স্টাডিজ বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রিতে ভর্তি হই। মূলত তখনই কম্পারেটিভ স্টাডিজের চর্চাটা শুরু হয়। আমরা নাস্তিক আর অমুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন জটিল জটিল প্রশ্ন তুলে আনতাম, তারপর সেটার ওপর ডিবেট করতাম। সেই সব বিতর্কের ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর আর সমাধান খুঁজে বের করতাম। যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসই হলো বিশ্বাসের আসল শক্তি। সে শক্তির অনেক প্রভাব।'

ইমাম থামলেন।

ওমার হেসে বলল,

'হ্যাঁ আমি সেই প্রভাবটা টের পাচ্ছি।'

যতই দিন যাচ্ছে ইমামের প্রতি মুগ্ধতা, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে ওমারের। ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া পুরো সময়টাই সে ইমামের সাথে থাকতে চায়। তাই চেষ্টা করে জামাতের নামাজগুলো ধানমন্ডি মসজিদে ইমামের পেছনে আদায় করতে। নামাজ শেষ হলে সবাই চলে গেলে ইমাম ওমারের কাঁধে ভর দিয়ে তার রুমে প্রবেশ করেন। এটা এখন মোটামুটি একটা রুটিন হয়ে গেছে। ইমামও তার এই তরুণ বন্ধুটিকে দারুণ পছন্দ করেন। সালাতের সালাম শেষে তিনি ঘুরে বসে প্রথমেই খোঁজেন জামাতে ওমার আছে কি না। ওমারকে দেখলেই কেন যেন তার চোখজোড়া শীতল হয়ে যায়। তিনি প্রাণ ভরে ওমারের জন্য দোয়া করেন। ইমাম বিশ্রামে থাকলে অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে ওমার মসজিদের তাকে রাখা কোরআন-হাদিসের বইগুলো পড়ে। কখনো মসজিদে শুয়ে থাকে। ইদানীং মসজিদে তাবলিগ জামাতের একটি দল এসেছে। সেই দলের দলনেতার নাম আনোয়ার। খাওয়ার সময় হলে ওমারকে ডেকে নিয়ে আসে। প্রথম দিন ওমারের খুব লজ্জা আর অস্বস্তি লেগেছিল। একটা বড় প্লেটে পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে খাবার খায়। প্রথম দিন লজ্জায় সে দুই-তিন লোকমা ছাড়া খেতে পারেনি। কিন্তু বিষয়টা তার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল, এক থালায় সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যদিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গভীর হয়। নিজে না খেয়ে মাছের বা মাংসের বড় টুকরাটা অন্য ভাইয়ের দিকে ঠেলে দেওয়াটা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ নিশ্চয়ই। আনোয়ার আর তার দল চল্লিশ দিনের চিল্লায় বের হয়েছে।

আনোয়ারের স্টেডিয়াম মার্কেটে ক্যাসেটের দোকান ছিল, তার ভাষায় 'দ্বীনের বুঝ' আসার পর সে হারাম ব্যবসা বন্ধ করে এখন সেখানে জায়নামাজের ব্যবসা চালু করেছে। সে ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান, মেট্রিক পাশ করার পর আর পড়েনি। আনোয়ার প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওমারকে 'দ্বীনের বুঝ' দেওয়ার জন্য। মসজিদের ইমামের সাথে ওমারের কী কথা হয় অথবা ইমামের সাথে ওমারের কি সম্পর্ক এসব কিছুই সে আন্দাজ করতে পারেনি। ওমার জিন্স আর শার্ট পরা হাল ফ্যাশনের যুবক, লম্বা লম্বা চুল, গালে দাড়ি নেই, কিন্তু জামাতে নামাজ পড়ে আর মসজিদে পড়ে থাকে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিত, মার্জিত ও ভদ্র ওমারকে আনোয়ারের খুব ভালো লাগে। আনোয়ারের মনে হয়েছে এই ছেলেটাকে তাবলিগে ঢুকাতে পারলে দ্বীনের অনেক বড় খেদমত করা হবে। তাই সে উঠেপড়ে লাগে ওমারকে তাবলিগের ছয় মূলনীতি বা উসুল বুঝাতে, যেমন— কালিমা, নামাজ, ইলম্ ও যিকির, একরামুল মুসলিমিন বা মুসলমানদের সহায়তা করা, ইখলাস ও নিয়ত এবং

তাবলিগ বা দাওয়াত। ওমারের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে খুব ভালো শ্রোতা। সেটা কুশোর সাইক্যাডেলিক কবিতা হোক অথবা আনোয়ারের দ্বীনি বয়ান হোক সবকিছুই সে খুব মনোযোগ দিয়ে আর গুরুত্ব দিয়ে শোনে। ওমারের এই শোনার একাগ্রতা আনোয়ারকে মুগ্ধ করে আর উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আনোয়ার প্রায় দশ বছর ধরে তাবলিগ করছে। কাকরাইলে তার বেশ প্রভাব। টাকনুর ওপর পায়জামা, লম্বা দাড়ি, সুরমা দেওয়া চোখ, আর গায়ে দামি আতর দেওয়া আনোয়ারের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা পবিত্র আর সরলতার ব্যাপার আছে। আন্তরিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধে ওমারকে যেভাবে সে আপন করে নিয়েছে সেটা তাকে মুগ্ধ করেছে। ইদানীং সে ওয়াক্তের নামাজ শেষে ওদের সাথে বসে নীল মলাটে বাঁধাই করা বই ফাজায়েলে আমলের পাঠ শোনে। নতুন কিছু নেই। স্কুল জীবনের ধর্ম শিক্ষা বই গুলোতে যা পড়েছে মোটামুটি সেসব কথাই ঘুরেফিরে বিভিন্ন রেফারেন্সে তারা বর্ণনা করে। তারা সবাই অত্যন্ত আন্তরিক আর শৃঙ্খলা মেনে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ইবাদত করে।

ওমার মসজিদে সময় কাটায় এর মূল কারণ ইমাম, ইমামের সঙ্গ তাকে প্রশান্তি দেয়। এর বাইরে আনোয়ারের আন্তরিকতার কারণে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে। বয়সে ওমার আনোয়ারের তিন-চার বছরের ছোট হলেও তারা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করে। আনোয়ার অনর্গল ওমারকে তাবলিগের বয়ান করতে থাকে। তার গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ বলার ভঙ্গি ওমারের ভালো লাগে। ওমার বোঝে আনোয়ার যা বলছে সেটা সে নিজে বিশ্বাস করে। পুরো টিমের সাথে ওমারের সখ্যতা তৈরি হয়ে গেছে। ইদানীং সে ইমামের সাথে কথা শেষ করে আনোয়ারের সাথে মসজিদেই ঘুমায়। ফজরের নামাজটা সবাই মিলে জামাতে পড়ে। তারপর সে ইমামের সাথে সময় কাটায়। আনোয়ারদের সাথে নাশতা করে। এদের রান্নার একটা আলাদা স্বাদ আর গন্ধ আছে। আনোয়ার বলে, 'এটা হলো বরকত'। আনোয়ার ধর্মের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে, ওমার বিশ্বাস করে যুক্তিতে। ওদের মধ্যে এটাই মূল পার্থক্য হলেও ওমার কোনো তর্ক করে না, কারণ ওমার আনোয়ারের পড়াশোনার লেবেলটা জানে। মোট কথা ওমার এই ১৫ জনের দলটাকে পছন্দ করেছে। এরা সবাই তাকে ভীষণ ভালোবাসে। এই সম্প্রীতি কেয়ারিং ভ্রাতৃত্ববোধ সবটাই এদের ইবাদতের অংশ। এই কয়দিনে ওমার যেন ওদের একজন হয়ে উঠেছে।

উনচল্লিশ দিনের মাথায় আনোয়ার ওমারের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল। একমাস পর আনোয়ার একটা জামাত নিয়ে যাবে পাকিস্তানের লাহোরে তাবলিগি ইজতেমায়, সেখানে ইজতেমা শেষ করে এক চিল্লায় যাবে পাকিস্তানের দুই শহর পেশওয়ার ও ইসলামাবাদ। লাহোর ইজতেমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মেহমানরা আসবে, তাদের দলে একজন ভালো ইংরেজি জানা ভাই লাগবে, সেটার জন্য ওমারকে তার যোগ্য মনে হয়েছে, সে রাজি থাকলে আনোয়ার তার নামটা

কাকরাইলের মারকাজে পেশ করত। আরও বলল যাতায়াতের জন্য প্লেন ভাড়া ছাড়া আর তেমন কোনো খরচ নেই। ওমারের টাকার সমস্যা থাকলে সেটাও আনোয়ার ম্যানেজ করবে। এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে ওমার ভাবনায় পড়ে যায়। বন্ধুদের সাথে তার প্রাত্যহিক আড্ডা বেশ আগেই শেষ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র মাঝে মাঝে রুশো এসে বসে থাকে মসজিদের পেছনের লেকের ধারের জঙ্গলের পাশে। মসজিদের জানালা দিয়ে ওমারকে ডাক দিলে সে বের হয়ে আসে। রুশোর পাশে বসে থাকে, রুশো আয়েশ করে একটা স্টিক টানে। দুজনের মাঝে খুব একটা কথা হয় না। দুজনই কথা হাতড়াতে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেখানে কথার খই ফুটত সেখানে দুইজন মানুষ হাতড়ে হাতড়ে কথা খুঁজে বের করে, তাও সে খুঁজে বের করা কথা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। তখন নিশ্চুপ বসে থাকে দুজন।

ওমারের এই পরিবর্তনটা বন্ধুরা মেনে নিয়েছে, কারণ তারা জানে, কি ভয়াবহ রকমের মন ভাঙার কষ্ট পেয়েছে ওমার। সবকিছু আগের মতো চললেও ভিতরে ভিতরে রুশোও খুব একা হয়ে গেছে। ওমার এক ও অদ্বিতীয় অসীম স্রষ্টার সন্ধান পেয়ে গেছে। তার অন্তরের অশান্তি দূর হয়েছে। গভীর রাতে অন্ধকারে দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করে সে ফজরের আজান পর্যন্ত প্রার্থনা আর বিশ্বজগৎ নিয়ে ভাবনায় ডুবে থাকে। কেন এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, কেন এমন অগনিত গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন তিঁনি বলছেন, 'এসব তিনি এমনি এমনি খেলাছলে সৃষ্টি করেননি'। সবকিছুর পেছনে লুকিয়ে আছে এক মহাজ্ঞানী স্রষ্টার উদ্দেশ্য। যেখানে মহাবিশ্বের সীমা পরিসীমা মানুষের সকল কল্পনাশক্তিকে হার মানায়, সেখানে সেই সৃষ্টিকর্তা বলছেন, 'তিনি অনন্ত তিনি অসীম'। মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে বলেই ওমার বুঝতে পারে তিঁনি সত্য বলেছেন। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার শুরু আছে তাই শেষও আছে, সেটা যত বড়ই হোক না কেন সেটা সসীম এবং সৃষ্ট। আর যিনি নিজেকে বলেন 'অসীম' তিনি অবশ্যই 'সৃষ্ট' নন, তিনি 'সৃষ্টিকর্তা'। তাই মহাকাশ নিয়ে ভাবলে ওমারের এখন আল্লাহর স্মরণ হয়, মহান সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করে সে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, আর মনে মনে বলে- আমি ক্ষুদ্র আপনি বড়, আপনি অনেক বড়, আপনি অসীম।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এই মানুষগুলোর সান্নিধ্য ওমার এনজয় করে। আগে যেমন বন্ধুদের সঙ্গ এনজয় করত। ওমারের একটা চেঞ্জ দরকার। এই শহর ছেড়ে কিছুদিনের জন্য দূরে কোথাও চলে গেলে মন্দ হয় না। আর যদি হয় সেটা এমন মানুষদের সাথে যারা সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে। আনোয়ারের প্রস্তাবটা নিয়ে ইমামের সাথে আলাপ করবে। ইমামের ধর্মচিন্তা আর আনোয়ারদের ধর্মচিন্তার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। ইমামের সাথে সে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সেসব বিষয় আনোয়ারদের মধ্যে নেই। কিন্তু লোকগুলোর রয়েছে আন্তরিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধ।

ইমাম ওমারের কাছে সবকিছু শুনে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। কী যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—

'তুমি তো ওদের সাথে মিশলে, তোমার কাছে কী মনে হলো, ওদের সাথে কি যাওয়া যায়?'

ওমার বলল—

'আপনার কাছে দ্বীন শেখার পর ওদের পার্থক্যটা ধরতে পারছি। তবে ওদের ধর্মচর্চার বাহ্যিক রূপটা আমার ভালো লেগেছে। অনেকটা স্কুলিংয়ের মতো।'

ইমাম বললেন-

'হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ, মূলত এমন চিন্তা থেকেই এদের শুরু হয়েছিল ১৯২৬ অথবা ১৯২৭ সালের দিকে উত্তর ভারতের মেওয়াত নামের জায়গা থেকে। মেওয়াত, হরিয়ানা আর রাজস্থান রাজ্যের মধ্যে পড়েছে। তাবলিগ জামাতের এই ধারণাটা আসে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াসের মাথা থেকে। তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের সাহারানপুরের মাযহারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক। তার পড়াশোনা ছিল দেওবন্দ মাদরাসায়। ব্রিটিশদের হাতে মোগলদের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে মূলত মুসলিমরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এটা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতাই ছিল না, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতাও ছিল। চরম হতাশা পেয়ে বসেছিল সেই সময়ের মুসলিমদের মধ্য। পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের পুনর্জাগরণ শুরু হয়। যেহেতু মুসলিমদের সাথে শত্রুতা আর যুদ্ধ করে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করেছে, তাই স্বভাবতই হিন্দুরা দ্রুত ব্রিটিশ রাজশক্তির সমীহ অনুগ্রহ আর কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়, তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখনকার হিন্দুরা এতই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে যে তারা মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য দুটি দল তৈরি করে, তাদের নাম 'শুদ্ধি' আর 'সংগঠন'। এরা এদের কার্যক্রমকে আন্দোলনে রূপ দেয়। শুদ্ধি আন্দোলনের কাজ ছিল ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটানো আর যে সব মুসলিমরা হিন্দুধর্ম থেকে মুসলিম হয়েছে তাদের আবার হিন্দু বানানো। মেওয়াতে রাজপুত সম্প্রদায় থেকে যারা মুসলিম হয়েছিল তাদের বলা হতো মিওয়ো, শুদ্ধি আন্দোলনকারীরা তাদের অনেককে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনে, কারণ সেই সব ধর্মান্তরিত মুসলিমদের বদ্ধমূল ইমানী জ্ঞান লাভ হয়নি। অন্যদিকে ইউরোপ থেকে আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে খ্রিষ্টান মিশনারী আর পাদ্রিরা। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য। সেই সময় মাওলানা ইলিয়াস 'তাহরিকে ইমান' বা 'ইমানের পথ' নামে এক আন্দোলন শুরু করে। প্রথমে মেওয়াতে, তার কিছুদিন পর তিনি তার মারকাজ দিল্লির নিজামুদ্দিনে নিয়ে আসেন। তার আন্দোলনের স্লোগান ছিল, "অ্যায় মুসলমান, মুসলমান বনো", অর্থাৎ হে মুসলমানেরা মুসলিম হও। তার সেই দাওয়াতে দ্রুত সাড়া পড়ে যায়। মাত্র ১৫ বছর পর ১৯৪১ সালের নভেম্বরে যে

জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পদানত করার জন্য। কোরআনের এইসব আয়াত মানুষকে সেই শিক্ষাই দেয়।'

ইমাম থামলেন, তার বুক চিরে বের হয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ নীরবতা নেমে এলো ইমামের রুমটাতে।

ওমার বলল—

'আমি আনোয়ারদের সাথে পাকিস্তান যাচ্ছি।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে এখন দেখতে মুসলমানের মতো লাগে।'

জীবনে এই প্রথমবারের মতো ওমার দাড়ি রেখেছে। রুশোর মতে, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল আর দাড়িতে ওমারকে নাকি এখন দেখতে বিটলসের জর্জ হ্যারিসনের মতো লাগে। ওমারকে সুন্নতী সুরতে দেখে আনোয়ার খুশিতে প্রায় কেঁদে দেয়। ইমাম ওমারের মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে মিটমিট করে স্বভাবসুলভ শিশুর মতো চাপা হাসি দিয়ে বললেন—

'ইমান শুরু হয় অন্তর থেকে, পরে দেহের বাইরে ইসলাম রূপে সেটা প্রকাশ পায়। ইসলাম শুরু হয় বাইর থেকে পরে অন্তরে প্রবেশ করে সেটা পূর্ণতা পায়। তুমি দেখতে যেমনই হও না কেন, তোমার কর্মটাই ইসলাম।'

মা নিজ হাতে ওমারের ব্যাগটা গুছিয়ে দিয়েছেন, একটা নীল জিন্সের প্যান্টের সাথে সাদা পাঞ্জাবি পরেছে ওমার। মাথায় একটা সাদা টুপি। পায়ে বেল্ট লাগানো স্যান্ডেল। চল্লিশ দিনের এক চিল্লা প্রায় দেড় মাসের জন্য পাকিস্তানে যাচ্ছে ওমার। মা ওমারের হাতে গুঁজে দিয়েছেন একশ ডলারের দশটা নোট। বেবিট্যাক্সি নিয়ে ওমারদের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছে আনোয়ার। মা আর ওমারের সব ভাইরা গেট পর্যন্ত এসেছে ওমারকে বিদায় দিতে। ভাইরা সবাই একে একে আলিঙ্গন করে ওমারকে বিদায় জানাল, সবশেষে মাকে অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকল ওমার, দীর্ঘ শ্বাস টেনে নিল মায়ের চুলের গন্ধ। মা বললেন—

'যে আল্লাহকে ভয় পায় না সে পৃথিবীর সবকিছুকেই ভয় পায়, আর যে আল্লাহকে ভয় পায়, পৃথিবীর সবকিছু তাকে ভয় পায়। মুসলমানের সাহস আসে আল্লাহর ভয় থেকে। সাহস রাখবি। আমার দোয়া তোকে ঘিরে থাকবে সব সময়।'

মা শেষবারের মতো আয়াতুল কুরসি পড়ে ওমারের মুখে আর বুকে ফুঁ দিয়ে দিলেন।

রানওয়ে দিয়ে ঝেড়ে এক দৌড় দিয়ে পিআইএ'র প্লেনটা উঠে গেল ঢাকার আকাশে। ওমার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিচে তার প্রিয় শহরটার দিকে। কী অদ্ভুত মায়াময় শহর তার সমস্ত প্রিয় মানুষগুলো বাস করে এই শহরে। পরিষ্কার ঝকঝকে

রোদ্রৌজ্জ্বল দিন। ওপর থেকে কোনো রাস্তাকেই আলাদা করে চেনা যায় না, নিশ্চয়ই ওখানে আছে এলিফেন্ট রোড, কাঁটাবন, শাহবাগ, এখন হয়তো রিক্সায় করে লামিয়া নিউমার্কেট ক্রস করে ইউনিভার্সিটির দিকে যাচ্ছে। লামিয়ার জন্য বুকের ভেতরের পুরানো ব্যথাটা চিনচিন করে উঠল। প্লেনটা ততক্ষণে ত্রিশ হাজার ফিট ওপরে উঠে গেছে। নিচে মেঘের রাজ্য। দৃষ্টিসীমা থেকে শহরটা হঠাৎ হারিয়ে গেল।

এপ্রিল, ১৯৯৮

লাহোর, পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী, লাহোর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এক ছোট্ট শহর, নাম রাইওয়াইন্ড। রাইওয়াইন্ড মারকাজ হলো পাকিস্তানের তাবলিগ জামাতের হেডকোয়ার্টার। মারকাজ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ইজতিমাগাহ্। ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি বছর এখানে তিন দিনের জন্য পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ মুসলিম সম্মেলন হয়। ঢাকার পর তাবলিগ জামাতের এটাই দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্মেলন কেন্দ্র। স্থানীয় এবং সারা পৃথিবী মিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের মিলন ঘটে এখানে। বাংলাদেশ থেকে ছোট ছোট জামাতে প্রায় দুইশো জন এসেছে এই ইজতিমায়। স্থানীয়দের থেকে বিদেশি মেহমানদের তাঁবুগুলো আলাদা ঘেরাও দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রায় ৫৫টি দেশ থেকে এবার প্রতিনিধি এসেছে রাইওয়াইন্ডে। প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর বয়ান হয় উর্দুতে। যারা উর্দু বোঝে না সে সব জাতির তাঁবুগুলোতে তাদের স্ব-স্ব দোভাষী সঙ্গে সঙ্গে তরজমা করে দেয়। বাংলাদেশিরা উর্দু বোঝে তাই এখানে কোনো অনুবাদক নেই। হিন্দির মতো বলে উর্দু মোটামুটি বুঝতে পারে তবে ইংরেজিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ওমার, তাই তাদের পাশের ইংল্যান্ডের তাঁবুতে বসে সে বয়ান শোনে। এটা আনোয়ারের পছন্দ নয়। আনোয়ার ওমারকে উর্দু তরজমা করে করে বোঝায়, যতক্ষণ পাশে থাকে। কিন্তু ওমারের মনে হয় আনোয়ারের অনুবাদটা মূল উর্দু থেকে বেশিরভাগই আলাদা। আনোয়ার মূল ভাবটা নিজের মতো করে অনুবাদ করে, যেটা ওমারের কাছে মনে হয় মূল বয়ানটা উর্দুভাষী কেউ করছে না বরং আনোয়ার নিজেই করছে। যদিও তাবলিগের মূল বয়ানটা সব ভাষাতে একই রকম, কোনো নতুনত্ব নেই। এখানে বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের দেখে ওমারের খুব ভালো লাগছে। তাবলিগী নিয়মকানুনের চাইতেও সে সেসব মুসলিম ভাইদের নিজেদের দেশ সংস্কৃতি, ইতিহাস তাদের জীবন সংগ্রাম এসব বিষয়ে কথা বলতে বেশি উৎসাহ বোধ করে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এমন আন্তর্জাতিক রূপ ওমারকে যারপরনাই মুগ্ধ করছে।

আজ ফজরের নামাজের পর বয়ান করছিলেন পাকিস্তানের তাবলিগ জামাতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা তারিক জামিল। তিনি তার বক্তব্যে মানুষের দোয়া বা প্রার্থনার শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

'আমি একদিন এয়ারপোর্ট রোড ধরে গাড়িতে করে যাচ্ছি আর দেখছি রাস্তায় বড় বড় বিলবোর্ডে একজন পপস্টারের ছবি টাঙানো, তখন আমি তার

হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। ঠিক বছরখানিক পর ইজতিমায় সে আমার তাঁবুর ভিতরে এসে উপস্থিত। তার নাম জুনায়েদ জামশেদ।' নামটা শুনে ওমার অবাক হলো। ভাইটাল সাইন নামে পাকিস্তানি একটা ব্যান্ড ঢাকায় খুব পপুলার। সেই ব্যান্ড ভাইটাল সাইনের ভোকালের নাম জুনায়েদ জামশেদ। সঙ্গে সঙ্গে রুশোর কথা মনে পড়ল ওমারের। তাঁবুর একটি নীরব জায়গায় বসে সে হাত তুলল মহান আল্লাহর কাছে। রুশোর কল্যাণ আর হেদায়েতের জন্য প্রাণ খুলে সে দোয়া করল। জুনায়েদ জামশেদের মতো এত বড় আর জনপ্রিয় পপস্টার যদি বদলে যেতে পারে তবে রুশোও নিশ্চয়ই বদলাবে।

লাহোরে এপ্রিলের তাপমাত্রা বাংলাদেশের মতো। জুনে এখানে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির উপরে উঠে যায়। বাতাসে আর্দ্রতা কম বলে আবহাওয়াটা এখনও আরামদায়ক আছে। বিদেশি মেহমানদের সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা আছে। মোটা তন্দুরি রুটি, বাশমতি চালের ভাত আর দুম্বার গোশত। তন্দুরি রুটি আর ঝোল ঝোল গোশতের স্বাদ ওমারের কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। খাবার খেতে খেতে তার কথা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সাথে। বিভিন্ন ভাষা আর বর্ণের মানুষ অথচ একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সুদৃঢ়, যাকে বলে গ্লোবাল ব্রাদারহুড। এখানে এসে সে জীবনে প্রথম কোনো চাইনিজ মুসলমানের দেখা পেল। এরা চায়নার জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলিম। উইঘুর মুসলিম জিয়াউদ্দিন ইউসুফ প্রায় জোর করেই ওমারকে তাদের তাঁবুতে নিয়ে গেল দুপুরের খাবারের জন্য। খেতে খেতে ওমার জানল, উইঘুর মুসলিমরা কি ভীষণভাবে নির্যাচিত হচ্ছে চাইনিজ সরকার দ্বারা। জিয়াউদ্দিন ইউসুফ তাদের দলের দোভাষীর কাজ করে, যেটুকু ইংরেজি জানে তাতে কাজ চলে যায়। তারা ২৫ জনের একটি কাফেলা এসেছে চায়নার জিনজিয়াং থেকে খুব গোপনে জীবন হাতে নিয়ে। তাজাকিস্তান আর আফগানিস্তানের দুর্গম বর্ডার ক্রস করে দীর্ঘ পথ ঘুরে পাকিস্তানে ঢুকেছে। উইঘুর মুসলিমদের কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। ফেরার পথে ওরা যদি চাইনিজ অথোরিটির হাতে ধরা পড়ে তা হলে ওদের সারাজীবন জেলে থাকতে হবে। হাতে হাতে রুটি নিয়ে একই পাত্র থেকে গোশতের ঝোলে রুটি চুবিয়ে সবাই খাচ্ছে। আজই প্রথম দেখা অথচ সবাই কত আন্তরিক আর আপন। একজন হাড় থেকে গোশৎ খুলে ওমারের রুটির ভেতরে ভরে দিল, আর হাড়টা নিজে চিবুল।

তারিম নদীর তীরের মানুষ ওরা, একসময় তাদের এই অঞ্চল ছিল স্বাধীন দেশ পূর্ব তুর্কিস্তান। উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের আমলে মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম প্রথম জয় করেন মধ্য এশিয়ার এক বিশাল অঞ্চল। এখনকার উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান কাজাকিস্তানসহ চীনের কাশগড় এই অঞ্চলের মধ্যে

পড়ে। গত শতকে চাইনিজ দখলদাররা তাদের দেশ দখল করে পূর্ব তুর্কিস্তান নাম বদলে দিয়ে রাখে জিনজিয়াং। সেই থেকে আজ অবধি চলছে তাদের ওপর দমন-পিড়ন ও নির্যাতন। সেসব নির্যাতনের রোমহর্ষক বর্ণনা শুনতে শুনতে খেতে ভুলে যায় ওমার। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ইমান দীপ্ত মানুষগুলোর মুখের দিকে।

ওমারকে খুঁজতে খুঁজতে আনোয়ার এসে হাজির হয় উইঘুরদের তাঁবুতে। ওমারকে তাদের সাথে খেতে দেখে কিছুটা বিরক্ত হয় আনোয়ার। বলে, 'আমি নিজে না খেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, আর তুমি এখানে মজা করে খাচ্ছ?'

'না আনোয়ার, আমি মজা করে খেতে পারিনি। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে একটি জাতির ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন হচ্ছে সেটা শুনলে তুমিও খেতে পারবে না।'

আনোয়ারের এসব বিষয় নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। সে বাংলাদেশি তাবলিগ জামাতের দলপতি বলে তাকে দল ব্যবস্থাপনায় অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। সে চায় ওমার সব সময় তার সাথে সাথে থাকুক, কিন্তু ওমারের নিজ দলের তাঁবু ছেড়ে বিভিন্ন দেশের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে বেড়ানোটা সে পছন্দ করে না। প্রতি ওয়াক্তের পর একই ফাজায়েলে আমলের পাঠে কোনো নতুনত্ব পায় না ওমার, তাই সে বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সাথে মিশে তাদের সম্পর্কে জানতে আর মতবিনিময় করতে বেশি আনন্দ পায়।

এক একটা মানুষ যেন এক একটা নতুন পৃথিবী, এক একটা মানুষ যেন এক একটা নতুন লাইব্রেরি। মানুষ দেখলে দেখা হয়ে যায়- কত বৈচিত্র আর রহস্য নিয়ে এই চরাচরে আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে গ্রহ-নক্ষত্রের দল। সেনেগালের কালো আবু কাসিম, ফ্রান্সের সাদা আহমেদ, সাউথ আফ্রিকার শ্যামলা নুরান, অস্ট্রেলিয়ার লম্বা জনাথন মুর, জাপানের বেঁটে শিমুজি এরকম নানা ভাষা-বর্ণ আকৃতির মানুষ এক কাতারে যখন দাঁড়িয়ে যায়, একটা আল্লাহু আকবর কমান্ডে যখন রুকু আর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন ওমার অনুভব করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মর্ম।

ওমার ধন্যবাদ জানিয়েছে আনোয়ারকে, কারণ তার কারণেই এখানে আসা আর এসেছে বলেই মানুষে মানুষে এমন সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্য সে দেখতে পেয়েছে। ওমারের এসব কথা শুনে আনোয়ার হাসে, আর বলে —

'এসব নিয়ে চিন্তা না করে নিজের আমলের দিকে নজর দাও। তসবিহ তাহলিল জিকিরে ফিকিরে বেশি সময় দাও, বেশি বেশি দোয়া কর, সফরে দোয়া কবুল হয়।'

'কেন, আমি যেটা করছি সেটা ইবাদত না?'

'আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি আমাদের সকল কর্মই ইবাদত, কিন্তু তোমাকে তাবলিগের নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে।'

এই মুহূর্তে আনোয়ারের সাথে তর্ক করার মতো অনেকগুলো যুক্তি ওমারের মাথায় এসেছে, কিন্তু সে চুপ থাকল। সে জানে আনোয়ার একটা দলীয় কাঠামো আর চিন্তার মধ্যে আটকে আছে, সেখান থেকে তাকে বের করা সম্ভব নয়।

আজ ইজতিমার দ্বিতীয় দিন। তাবলিগের মুরুব্বিরা ছয় উসুলের মধ্যে দাওয়াতে দ্বীনের মেহনতের ওপর গুরুত্বারোপ করে বয়ান করেন। গরম লু হাওয়া বইছে, তাঁবুর ছায়ায় লক্ষ লক্ষ মুসল্লি বয়ান, তাশকিল, তসবি-তাহলিলে মগ্ন। বাংলাদেশি তাঁবুতে আসরের নামাজ পড়ে ওমার বের হলো উইঘুর মুসলিম জিয়াউদ্দিন ইউসুফের সাথে দেখা করতে। লোকটার প্রতি ওমারের মায়া তৈরি হয়ে গেছে। তার জীবন সংগ্রাম আর দ্বীনের ন্য আত্মত্যাগের গল্পগুলো ওমারকে আপ্লুত করেছে। পাঁচটা তাঁবু অতিক্রম করে তে হয় উইঘুর চাইনিজদের তাঁবুতে। হঠাৎ করে কিছু পরিষ্কার ইংরেজি শব্দ মারের কানে আসল। থমকে দাঁড়াল, সেই শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে সে ঢুকে ড়ল আফগানদের তাঁবুর ভেতরে। পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশ হওয়াতে আফগান শেষ করে পশতুনদের সংখ্যা এখানে অনেক। তাঁবুর মুখে বেশ জটলা। ভিড় ঠেলে তরে ঢুকে দেখল প্রায় তার বয়সি এক যুবক ইংরেজিতে বয়ান করছে। শ্রোতারা খানে বেশিরভাগই বিদেশি। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে তার বয়ান শুনছে। ডানে মে তাকাতেই চোখ পড়ল অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা নওমুসলিম জনাথন মুর-এর পর। জনাথন ইশারায় তাকে তার পাশে এসে বসতে বলল। ওমার তার পাশে বসে থমেই জিজ্ঞেস করল —

'ইনি কে?'

ফিসফিস করে জনাথন বলল—

'এর নাম খালিদ ইবনে হিশাম, আরব-আফগান। আফগানিস্তান থেকে কটা বড় জামাত নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে এখন যেটা বয়ান করছে সেটা তাবলিগের াজায়েলে নেই।'

মার জিজ্ঞেস করল,

'কী সেটা?'

জনাথন আরবিতে বলল,

'আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।'

'অর্থ বলো।'

'এর অর্থ হলো আল্লাহর পথে যুদ্ধ।'

ওমার আর কোনো কথা না বলে খালিদের বয়ানের দিকে মনোযোগ দিল। খালিদের ইংরেজি উচ্চারণের ভিতরে আরবি টান আছে। একহারা লম্বা গঠন। গায়ে

আরবি পোশাক খোলা মাথায় ইয়েমেনী লাল চেকের পাগড়ি। খালিদ সুদর্শন যুবক। স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরস্থিরভাবে বলছে আফগানিস্তানের ইতিহাস—

'আমরা একটা কথা বলে থাকি, আল্লাহ যখন কোনো পরাক্রমশালী জাতিকে ধ্বংস করতে চান তখন তার মাথায় আফগানিস্তান আক্রমণের চিন্তা ঢুকিয়ে দেন। ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের ৩২৬ বছর আগে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ৪১ হাজার দুর্ধর্ষ গ্রিক মেসিডোনিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণের জন্য রওনা হয়েছিল। পথিমধ্যে আলেকজান্ডার প্রথম রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এই আফগানিস্তানের মাটিতে। আফগানদের হাতে, আফগানিস্তান আর পেশোয়ারের মধ্যবর্তী উপত্যকা মাসাজার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নাস্তানাবুদ আলেকজান্ডার প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পায়। পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের পরাজয় ঘটে পানিপথ যুদ্ধজয়ী আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালির হাতে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, সেই ব্রিটিশ বাহিনী দুইবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে আফগানিস্তানের মাটিতে। ব্রিটিশদের সমর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম পরাজয় ঘটেছিল আফগানিস্তানে। প্রথম ঈঙ্গ-আফগান যুদ্ধে গান্দামাক গিরিপথের অ্যাম্বুশে সাড়ে চার হাজার যোদ্ধার একটা ব্রিটিশ রেজিমেন্টের একজন মাত্র সৈন্য বাদে বাকি সবাই নিহত হয়েছিল। আর সর্বশেষ সবাই জানেন, রাশিয়ান পরাশক্তির লজ্জাজনক শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল আফগানিস্তানের মাটিতে। সেটা ছিল এমন পরাজয় যা পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছিল। মহান আল্লাহ আফগানিস্তানের মাটিকে তার রাস্তায় জেহাদের জন্য কবুল করে নিয়েছেন। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা তালিবানরা কাবুল দখল করে সেখানে পরিপূর্ণভাবে ইসলামি হুকমাত বা শরিয়া আইন কায়েম করি। এই আধুনিক সময়ে পৃথিবীর একমাত্র খেলাফতের শাসন যদি দেখতে চান তবে আপনারা আফগানিস্তানে আসুন। আমাদের আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের শাসনব্যবস্থা দেখলে আপনাদের মনে পড়বে সোনালি অতীতের মদিনার শাসনব্যবস্থার কথা।'

জনাথন মুরের কানের কাছে মুখ এনে ওমার ফিসফিস করে বলে—

'ও যা বলছে এসব সত্যি?'

কিছু অবাক হয়ে জনাথন বলে,

'কেন, তুমি আফগান যুদ্ধের কথা শোননি?'

ওমার বলল—

'হ্যাঁ, রাশিয়ানদের পরাজয় আর তার পরবর্তী গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত জানতাম, কিন্তু সে এখন যা বলছে এসব জানতাম না।'

জনাথন বলে—

'খুব ইন্টারেস্টিং কাণ্ড ঘটছে আফগানিস্তানে, এদের বাহিনী হঠাৎ করে [illegible] নিয়েছে রাজধানী কাবুল।'

খালিদের দিকে পুরো মনোযোগ রেখেই ওমার জনাথনকে জিজ্ঞেস করল-
'ওদের বাহিনীর কী যেন নাম বলল?'
জনাথন মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দিল—
'তালিবান।'
'মানে কী?'
'তালিবান মানে ছাত্র। রাশিয়ানদের সাথে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আফগান শরনার্থীদের জন্য যেসব মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল, সেখানকার ছাত্রদের নিয়ে তালিবান নামে একটা বিপ্লবের শুরু হয়েছিল। এরা সেই তালিবান।'

ওমার খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে খালিদের মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা। খুব সহজ আর সাবলিল ভাবে খালিদ তার জাতি আর তাদের নতুন বিপ্লবের কথা বলে যাচ্ছে।

ইমাম বলতেন, 'সত্য বিশ্বাসের বাণী আসে হৃদয় থেকে। সত্য যখন কথা বলে তখন মুখ বা স্বরতন্ত্র কথা বলে না, মূলত কথা বলে তার হৃদয়, সেটা অন্য হৃদয়কে স্পর্শ করে।'

খালিদের কথা ওমারকে স্পর্শ করছে। ওমার ধ্যানমগ্ন হয়ে শুনছে। তার কথা শুনতে শুনতে আফগানিস্তানকে তার একটা রূপকথার দেশের মতো মনে হচ্ছে। যেখানে রুক্ষ প্রান্তরে ইনসাফের ছড়ি হাতে রাতের আঁধারে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখার জন্য ছদ্মবেশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু... হঠাৎ মাগরিবের আজানের শব্দে ঘোর ভাঙে ওমারের।

ইজতিমার হোস্ট হিসেবে পাকিস্তানিদের আতিথেয়তায় ওমার মুগ্ধ। ওমার ভেবে অবাক হয় এরাই সেই জাতি যারা তার মুসলিম ভাইয়ের ওপর ৭১ সালে কি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। ওমার বাংলাদেশ থেকে এসেছে শুনলে সাধারণ পাকিস্তানিরা কেন যেন বিশেষ খাতির করে। ওরা জানে বাংলাদেশ একদিন তাদেরও দেশ ছিল, তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুলে সেই দেশটা ভেঙে গেছে। বেশিভাগ পাকিস্তানি শুধু এইটুকুই জানে। ইসলামাবাদের ইনস্টিটিউট অফ স্পেস টেকনোলজির ছাত্র নাসিম এসেছে ইজতিমায়। তাকে জিজ্ঞেস করেছিল ওমার, 'তোমরা কি জানো ১৯৭১ সালে তোমরা আমাদের দেশে কী করেছিলে?'

এই প্রশ্নে নাসিমের স্বপ্রতিভ মুখমণ্ডল হঠাৎ করে কালো হয়ে গিয়েছিল। ওমারের দুই হাত চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে ছিল, তারপর বলেছিল—

'হ্যাঁ, আমি যেটুকু জানি, আর আমাকে যেটুকু জানতে দেওয়া হয়েছিল তারও চেয়ে অনেকগুণ বেশি জঘন্য ছিল সেই ঘটনা। আমি বইপত্র আর বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকা পড়ে জেনেছি কী নির্মম আচরণ করেছিল আমার স্বজাতি তোমাদের

ওপর। আমি ব্যক্তিগতভাবে লজ্জিত, আমাদের জেনারেশনের এমন আরও অনেককে পাবে যারা আমার মতো করে ভাবে। হয়তো কোনো একদিন আমরা জাতীয়ভাবে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব। ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের ক্ষমা চাইতে লজ্জা কীসের বলো।'

ওমার কোনো কথা বলেনি। নাসিমের মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে তার মায়া লাগছিল। এবার সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরল নাসিমের হাত। মনে পড়ল ইমামের কথা।

তিনি বলেছিলেন-

'মুসলিমদের মেরুদণ্ড সেদিন থেকেই ভাঙা শুরু হয়েছে যখন তারা দ্বীনি বন্ধন বা উম্মাহ্ থেকে ভৌগোলিক জাতিয়তাবাদী পরিচয়ে পরিচিত হতে শুরু করেছিল। উপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের বিশাল মুসলিম জনপথ দখল করে শোষণ শাসন আর লুণ্ঠন শেষ করে ফিরে যাওয়ার সময় মানচিত্রের ওপর স্কেল টেনে টেনে ভূমিগুলোকে খণ্ড খণ্ড করে বলেছে এই নাও স্বাধীনতা আর এসব তোমার দেশ, তুমি মুসলিম নও, তোমার পরিচয় তুমি মিশরি, তুর্কি, কাতারী, সৌদি, কুয়েতি, সিরিয়ান, সোমালী, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর আপন আপন ভৌগোলিক জাতিয়তাবাদী পরিচয়ে পরিচয় দিতে নিজেরা গর্ব অনুভব করা শুরু করল। নিজ দেশ জাতিকে অর্থে অস্ত্রে শক্তিশালী করল। তারপর জাতীয় অহংকারে তারচেয়ে দুর্বল জাতিকে অবজ্ঞা করা শুরু করল। পাকিস্তানিদের অহংয়ে সেদিন সবচেয়ে বেশি লেগেছিল যখন একজন বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, যে হবে দুই পাকিস্তানের শাসক। অহংকারের বশে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেটা মেনে নিতে পারেনি। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর হিংস্রো হায়নার মতো ঝাপিয়ে পড়েছিল। এই অহংকারের নাম জাতিয়তাবাদ। আরবিতে এটাকে বলে আসাবিয়্যাত। আবু দাউদ শরিফের হাদিস, আর মেশকাত শরিফের ৪৬৮৮ নম্বর হাদিসে হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ, আসাবিয়্যাত কী? তিনি বললেন, 'অন্যায় কাজে তোমার স্বজাতিকে সাহায্য করা।'

মাগরিবের নামাজটা ওমার আফগানদের তাঁবুতেই পড়ল। নামাজ শেষে সবাই খালিদকে কেন্দ্র করে বসল তার বয়ান শোনার জন্য। আসরের সময়ের মতো ভীড়টা এখন নেই। ফলে ওমার খালিদের খুব কাছাকাছি বসার সুযোগ পেল। জনাথন ওমারকে খালিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। খুব আন্তরিকতার সাথে খালিদ হাত মিলাল। নিজের পরিচয়ে বলল নিজের নাম। ওমার সরাসরি খালিদকে প্রশ্ন করল—

'এখন তোমরা কার বিরুদ্ধে জিহাদ করছ?'

এই প্রশ্নে খালিদ হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়।

ওমারের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার প্রশ্নের ধরনটা বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর খালিদ ঈষৎ হেসে উল্টো জিজ্ঞেস করে—

'তুমি কি সাংবাদিক?'

ওমার হেসে উত্তর দেয়—

'এমন একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাকে কি সাংবাদিক হতে হবে?'

'দেখ পশ্চিমা মিডিয়া আমাদের নামে দুর্নাম ছড়ানোর জন্য আমাদেরকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে তারপর সেই প্রশ্নের উত্তর দিলে, সেখান থেকে খণ্ডিত খণ্ডিত কথা নিয়ে তারা প্রচার করে। পৃথিবীর সবাই জানে আমরা কেন আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছি, আর কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, একমাত্র তুমি ছাড়া।'

খালিদের এই উত্তরে সবাই হেসে দেয়। ওমার লজ্জা পায়। খালিদ বিষয়টা বুঝতে পেরে ওমারের কাঁধে একটা হাত দিয়ে বলে —

'ব্রাদার আমি মজা করলাম। শোনো, আমাদের যুদ্ধটা হলো যুদ্ধ থামানোর যুদ্ধ। আমাদের গৃহযুদ্ধটা শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। আমাদের নিজেদের অন্তঃদ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের দেশটা দখল করে নেয়। আমরা আফগানরা নিজেরা যতই রক্তপাত করি না কেন, বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক হয়ে যাই। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল দশ বছর আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমাদের সেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা মুজাহেদ্বীন নামে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করে। কমিউনিস্ট রাশিয়ানরা ছিল নাস্তিক, ওরা ওদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদেরকে ধর্মহীন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টা। আমরা আমাদের সেই যুদ্ধটাকে ইসলাম রক্ষার যুদ্ধ হিসেবে দেখেছি। আমাদের জন্য সেটা ছিল আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ। সারা পৃথিবীর মুসলিমরা আমাদের সেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছিল। তাই দলে দলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা আফগান মুজাহেদ্বীনদের সাথে যোগ দিয়েছিল জেহাদে। আমাদের স্যাকরিফাইস ছিল বর্ণনাতীত। আমাদের ১৫ লক্ষ মানুষ শহিদ হয়েছে সে যুদ্ধে। ৩০ লক্ষ মানুষ হতাহত হয়েছে। ৫০ লক্ষ আফগান শরনার্থী হয়েছে বিদেশে। আমাদের দেশ পুরোটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য গোরস্তান বানিয়ে দিয়েছিলাম, যেমন ভিয়েতনাম ছিল আমেরিকার জন্য গোরস্তান। পরাজিত রাশানরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলে মুজাহেদ্বীন দলগুলো নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে শুরু করে ভ্রাতৃঘাতী সিভিল ওয়ার। কথা ছিল রাশানরা বিতাড়িত হওয়ার পর আমরা আমাদের দেশটা আবার নতুন করে গড়ে তুলব। জেহাদের যে

চেতনায় আমরা আফগানিস্তানকে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম সেটা তার সন্তানদের স্বার্থ অনৈক্য আর গোয়ার্তুমির জন্য ধ্বংস হতে বসেছিল। সেই অরাজকতা আর আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তার নতুন বাহিনী প্রেরণ করেছেন আফগানিস্তানে। আমরা তালিবানরা হলাম সেই বাহিনী। নতুন প্রজন্মের মুজাহেদ্বীন। এক বছরের চেষ্টায় আমরা বিবাদমান মুজাহেদ্বীন দলগুলোর হাত থেকে কাবুল দখল করে ফেলি। ইরান, তুর্কেমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ঘেঁষা সীমান্তবর্তী কিছু প্রদেশ ছাড়া আফগানিস্তানের ৬০ ভাগ এখন আমাদের দখলে। বাকি অঞ্চলগুলোতে জোরেসোরে জেহাদ চলছে। আমরা আসমান থেকে গায়েবি মদদ পাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন সমগ্র আফগানিস্তানে আমরা ইসলামের পতাকা ওড়াব। ইনশাআল্লাহ আফগানিস্তান হবে আধুনিক পৃথিবীর বুকে আমিরুল মুমিনিন শাসিত প্রথম ইসলামি দেশ।

এখন যে অংশটুকু আমাদের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে শাসিত হচ্ছে, সেখানে চলছে নিখাদ কোরআনের শাসন, ন্যায়বিচার আর নিরাপত্তার জমিন সেটা।

তুমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ, ওমার?'

ওমার মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল—

'কোনটা বেশি জরুরি, জেহাদ না তাবলিগ?'

খালিদ তাৎক্ষণিক উত্তর দিল—

'জেহাদ হলো জমিন আর তাবলিগ হলো আবাদ। কিন্তু দুঃখজনক হলো তোমাদের তাবলিগের ফাজায়েলের গ্রন্থগুলোর মধ্যে জেহাদের কোনো ফাজায়েল নেই।'

'তোমাদের তাবলিগ বলছ কেন? তুমি কি এই তাবলিগের অংশ নয়?'

'না ভাই, আমি এখানে এসেছি জেহাদের দাওয়াত নিয়ে আর মুসিলম বিশ্বকে জানাতে যে আমরা একটি পরিপূর্ণ ইসলামি হুকুমতের রাষ্ট্র কায়েম করেছি যে রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। যেখানে জনগণের সেবা করার জন্য একজন আমিরুল মুমিনিন আছেন যিনি দরিদ্র মানুষের মতো জীবনযাপন করেন। তিনি কোনো প্রেসিডেন্টসিয়াল প্রাসাদে থাকেন না। মাটি দিয়ে বানানো কুঁড়েঘরে থাকেন, দড়ির খাটিয়াতে ঘুমান। লবণ দিয়ে রুটি খান। সর্বনিম্ন মানের জীবনযাপনকারী সাধারণ আফগানদের সমতুল্য তার জীবনযাপন সামগ্রী। তিনি বিশ্বাস করেন দরিদ্র আফগানদের তুলনায় যদি তিনি এক তিল পরিমাণ বেশি ভালো থাকেন তবে আল্লাহর কাছে সেই অংশটুকুর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তার বাড়ির উঠোনে বসে তিনি রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করেন। সেই উঠোনের এমন প্রভাব যে অপরাধীরা দার-উল-ইসলামের ভেতরে অপরাধ করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। সারা আফগানিস্তান জুড়ে হাইওয়েগুলো ছিল ডাকাত আর চেকপোস্ট বসিয়ে

চাঁদাবাজির স্বর্গ। কয়েক কিলোমিটার পরপর চেকপোস্টে পণ্যবাহী ট্রাকগুলো বিভিন্ন অস্ত্রধারী গ্রুপগুলোকে চাঁদা দিতে দিতে সর্বশান্ত হয়ে যেত। সেই পথগুলো আজ এমন নিরাপদ যা আফগানিস্তানের ইতিহাসে আগে কেউ কখনো দেখেনি। এখন যে কেউ প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এক ট্রাক সোনা নিয়ে একাকী নিশ্চিন্তে জালালাবাদ থেকে কাবুল কান্দাহার এমনকি হেরাত পর্যন্ত চলে যেতে পারে। নারীদের জন্য লন্ডন, নিউইয়র্কের রাস্তার চাইতেও নিরাপদ এখন রাতের অন্ধকারের আফগানিস্তানের অলিগলি পথঘাট।'

জনাথন প্রশ্ন করল—

'তোমরা নাকি নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে, মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিয়েছ, এটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, এটা আপাতত সত্যি। দেখ, আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধই করিনি, পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতি আর বিশ্বাস রক্ষার যুদ্ধও করেছি। তাদের আগ্রাসনের আগে-পরে মিলিয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে তারা আমাদের সংস্কৃতি আর বিশ্বাস নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। ওরা চেয়েছে কোরআন বাদ দিয়ে আমাদেরকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের লাল বই পড়াতে আর নারী স্বাধীনতার নামে আমাদের নারীদেরকে বেপর্দা করতে। আমাদের ভেতরে বস্তুবাদী সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিতে। হা, অনেক আফগানের ক্ষেত্রে তারা সফল হয়েছিল, তাদের পক্ষে কথা বলার মতো স্থানীয় অনেক কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী তারা তৈরি করতে পেরেছিল যুদ্ধত্তোর আফগানিস্তানে। শিক্ষাব্যবস্থার নামে যেটা টিকে ছিল সেটা ছিল বিশৃঙ্খল গোলমেলে। সেই শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে আমাদের জাতীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির অনেক কিছু ছিল না। তালিবান বিপ্লব একটা সশস্ত্র এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। আমরা ভাঙাচুরা ঘুণে ধরা সবকিছুকে উৎখাত করে আবার নতুন করে সৃষ্টি করছি। এখন সেই ট্রানজিশনাল প্রিয়ড চলছে। তাই সবকিছু বন্ধ। সেটাই পশ্চিমা মিডিয়াগুলো রং মাখিয়ে প্রচার করে যে আমরা নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে। ইনশাআল্লাহ আবার সবকিছু চালু হবে। আমরা কীভাবে নারী শিক্ষা বন্ধ করব যেখানে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা ছিলেন একজন জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান মহিলা। তার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ পেয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। সেই অর্থে তিনি ছিলেন উম্মাহ'র শিক্ষক। তার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ২২১০টি হাদিস। আমাদের নবি মুহম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর, ৪৪ বছর ধরে তিনি তাঁর বানী প্রচারে অবদান রেখেছেন। অনেক অজানা বিষয়ে মীমাংসার জন্য সাহাবি রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহুমগণ তার শরণাপন্ন হতেন। তিনি অনেক বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন, শুধু হাদিসই নয়, তিনি কবিতা জানতেন, জানতেন বিভিন্ন রোগের ঔষধ। এমন একজন জ্ঞানী মহিলা যে জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই জাতি কীভাবে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে থাকবে?

আমরা এমন এক দ্বীনে বিশ্বাস রাখি যেখানে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন একজন নারী, তিনি খাদিজা রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা। এই দ্বীনের প্রথম শহিদ একজন নারী, তিনি সুমাইয়া রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলেন তিনি একজন নারী, তিনি ফাতিমা রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা। একদিনে ইসলামের জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছিলেন তিনি একজন নারী, তিনি খানসা রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তার চার সন্তানের সবাই শহিদ হয়েছিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে একজন নারীর নাম আছে, তার নাম খাওলা বিনতে আল আজওয়ার রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহা। সেই জাতি কীভাবে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে থাকবে?'

এই প্রশ্নটি করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন উত্তরের অপেক্ষা করছে খালিদ।

জনাথন মাথা নাড়ছে, আর মুগ্ধ ওমার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খালিদের বাদামি চোখের দিকে।

ফজরের নামাজের পর বিশেষ বয়ান শেষে আখেরি মুনাজাতের ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হয় তিন দিনের ইজতেমা। বিদেশি মেহমানদের ভেতর বাজছে বিদায়ের সুর। এখন সবাই সারা পাকিস্তানে আর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে। ইজতেমাগাহ্ থেকে বাংলাদেশি জামাতের এক অংশ অবস্থান করছে তাবলিগের রাইওয়াইন্ডের মারকাজে। যারা পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে চিল্লা দিতে যাবে তাদেরকে এখান থেকে পরিচালনা করা হবে। খালিদ এবং তার জামাত এখন অবস্থান করছে মারকাজে। তাকে ঘিরে সব সময় একটা আন্তর্জাতিক সমাবেশ বিরাজ করে। খালিদের ব্যক্তিত্ব, সহজ ইংরেজি ভাষা আর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ সবাইকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। খালিদের বাবা আরব। দখলদার সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে যে সমস্ত আরব প্রথম দিকে আফগানিস্তানে এসেছিল খালিদের বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম ছিলেন তাদের মধ্যে। দুর্ধর্ষ মুজাহেদ্বীন কমান্ডার জালালউদ্দিন হাক্কানীর নেতৃত্বে পাকতিয়া প্রভিন্স আর খোস্ত এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন খালিদের বাবা। যুদ্ধ শেষ হলে একদল আরব ফিরে যায় আপন দেশে, আরেক দল থেকে যায় আফগানিস্তানে। জালালউদ্দিন হাক্কানীর অনেক প্রিয় যোদ্ধা ছিল খালিদের বাবা আব্দুল্লাহ। তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিয়ে চিরস্থায়ী আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন তাকে। খালিদের সৎ মা পশতুন, নিজের মা আরব। ইমানদার আরবরা সব সময় শহিদের মৃত্যু কামনা করে। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অংশ নেওয়াটাকে তারা সৌভাগ্য মনে করে। অনেক আরব আফগানিস্তানে এসেছিল তাদের পুরো পরিবার নিয়ে। সেসব আরব বাবারা তাদের ছেলেদের হাতে কালাসনিকভ রাইফেল তুলে দিয়ে ট্রেঞ্চের ভেতরে তাদের সাথে সাথে রেখে জেহাদ শেখাত। খালিদও তেমনি তার চাচাদের সাথে চলে এসেছিল খোস্তে।

আশির দশকে আফগান জেহাদে অংশ নেওয়াটা সমগ্র আরব ভূমিতে আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। যারা স্বশরীরে জেহাদে অংশ নিতে পারত না তারা অকাতরে ডলার রিয়েল দিনার পাউন্ড সাদাকা হিসেবে পাঠাত আফগানিস্তানে। এদের টাকায় তৈরি হয়েছে যুদ্ধকালীন কংক্রিটের বাংকার, ফিল্ড হসপিটাল, যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা। সে সময় একজন বিখ্যাত আরব যোদ্ধা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আল আজ্জাম পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়, সেটার নাম ছিল মাক্তাব আল-খাদামাত। তাদের কাজ ছিল আরব

ধনীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেটা আফগান যুদ্ধে ব্যয় করা। এদের অর্থায়নে শরনার্থী শিবিরগুলোতে বেশ কিছু ভালো স্কুল কলেজ তৈরি হয়েছিল। ধর্মীও শিক্ষার পাশাপাশি সেখান থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে খালিদ। ওমার আর অস্ট্রেলিয়ান জনাথনের মতো খালিদের আরও কিছু বিশেষ আন্তর্জাতিক ভক্ত তৈরি হয়েছে। সেনেগালের কাসিম, ফ্রান্সের আহমেদ, সাউথ আফ্রিকার নুরান, জাপানের শিমুজী, এরা ছাড়াও পাকিস্তান আর মধ্য এশিয়ান দেশগুলোর বয়সে তরুণ উৎসাহী তাবলিগী ভাইয়েরা খালিদের কাছ থেকে আফগানিস্তানের জেহাদের কথা শুনতে অনেক আগ্রহী। আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধে মুজাহেদ্বীনরা যেভাবে সারা বিশ্বের মুসলিমদের সমর্থন পেয়েছিল, তালিবানরা এখন তেমন সমর্থন আশা করছে। তাই তাবলিগ জামাতের এই ইজতেমায় খালেদকে পাঠানো হয়েছে। খালিদ আজ মুসলিম উম্মাহ'র জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলছে—

'প্রিয় ভাইয়েরা

মুসলিমের জীবন হলো সৈনিকের জীবন। আমাদের নামাজের কাতার যেন সিসাঢালা কঠিন প্রাচীর, যেভাবে সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী প্যারেডের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। একজন সেনাপতির আল্লাহু আকবর কমান্ডে আমরা একের পর এক রুকু সেজদায় আনুগত্য প্রকাশ করি। পৃথিবীর আর কোনো সৈন্যবাহিনী আছে যারা দিনে পাঁচবার নিজেদেরকে প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজির করে? আমাদের হজ্বের কষ্ঠসাধ্য সফর, মিনায় তাঁবুতে বাস, মোজদালিফায় খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন, আরাফাতের রুক্ষ পাথুরে ভূমিতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর থেকে আসা সৈন্যদের আন্তর্জাতিক সমাবেশ, তারপর আমাদের কুরবানি, এই বাৎসরিক ক্যাম্পিং আমাদের সৈনিক জীবনের চর্চার অংশ। সৈনিকদের কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় আমাদের রোজা। সকল জৈবিক ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে সৈনিকরা সভ্য না হলে কীভাবে এরা অসভ্যতা বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়বে। মহান আল্লাহ এই সৈন্যবাহিনী তৈরি করে তাদের ওপর যুদ্ধ বা জিহাদ বা কিতালকে ফরজ করে দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে আমাদের জন্য নামাজ-রোজা-হজ-যাকাত ফরজ, সেভাবেই ফরজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। দেখুন, আল কুরআনে সুরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে কী ভাষায় রোজাকে ফরজ করা হয়েছে, "কুতিবা আলাই কুমুস সিয়াম।" ঠিক একই ভাষায় সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে কিতাল বা জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে, "কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল," অর্থাৎ তোমাদের জন্য কিতাল বা জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে।

আপনারা নিশ্চই দেখেছেন সৈন্যদের প্রশিক্ষণ শেষে ধর্মগ্রন্থ ছুঁইয়ে বা দেশাত্মবোধক বাক্য বলে তাদের কাছ থেকে শপথ নেওয়া হয় যে, তারা তাদের দেশ বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঠিক তেমনি আপনি যেদিন থেকে এই সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছেন অর্থাৎ মুসলিম হয়েছেন সেদিন থেকে আপনার

জীবন আর আপনার নয়। কারণ আপনি ওটা জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। সূরা তওবা'র ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুসলমানের জীবন এবং তার সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধে তারা মারে নয়তো মরে। তওরাত ইঞ্জিল এবং কোরআনে তিনি এই সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল, আল্লাহর চেয়ে উত্তম প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা আল্লাহর সাথে করেছ। আর এটাই মহা সাফল্য।"

প্রিয় ভাইয়েরা

এই মহা সাফল্যের জীবন পেতে হলে আপনাদেরকে আফগানিস্তানে যেতে হবে। এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটার বিষয়ে কোরআনের ১৬৪ টি জেহাদের আয়াত নাজিল হয়েছে। আমাদের সম্মানিত মুজাহেদ্বীন ভাইয়েরা এই সাফল্য লাভ করার জন্য, দখলদার সোভিয়েত রাশিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন আফগানিস্তানে। সেই যুগ গত হয়ে গেছে, তাদের অনেকে সেই সাফল্য লাভ করে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। এই জেহাদ পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। প্রকৃত মোমিনরা যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছেন তারা সেই সব যুদ্ধরত জমিন খুঁজে খুঁজে সেখানে পৌঁছে যাবেন সেই লেনদেনকে বুঝে নিতে যেটা তারা আল্লাহর সাথে করেছেন আর আল্লাহ তাদের সাথে করেছেন। সেই চোখ কখনো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে না যে চোখ অন্ধকার রাতে রাইফেল হাতে দার-উল-ইসলামের সীমান্ত পাহারা দেয়। জীবনে অন্তত একটা রাত্রি হলেও সেই এবাদতের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তানে আসুন। আপনার লাইলাতুল কদরের রাত মিস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন ইসলামি জমিন প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত যোদ্ধার প্রতিটি রাতই কদরের রাত।'

খালিদের তেজদীপ্ত আবেগময় ভাষণ উপস্থিত জামাতের ভিতর এতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে খালিদ তার বক্তব্যে কয়েক মুহূর্তের বিরতি দিলে এক অপার্থিব নীরবতা নেমে আসে সেখানে।

'আমাদের চিল্লা দেওয়ার জায়গাটা বদলাতে হবে।'

জোহরের পর পেটভরে খেয়ে একটা পরিতৃপ্তির ঘুমের জন্য পাশফিরে শুয়ে কেবল চোখটা লেগে এসেছে, এমন সময় পেছনের বেড থেকে ওমারের কথাটা আনোয়ারের কানে গেল। ওমারের এই কথার অর্থটা বুঝতে প্রায় মিনিট খানিক সময় লাগল আনোয়ারের। বুঝার পর তার ঘুম উধাও হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো সাড়া না দিয়ে সে চুপচাপ সেভাবেই পড়ে আছে। ওমার তার বেডে বসে পেছন থেকে আনোয়ারের পিঠের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় আছে। ওমার জানে আনোয়ার তার কথা শুনেছে, প্রতিক্রিয়াটা এখন ভেতরে হচ্ছে, বের হতে একটু সময় নেবে। বেশ সময় নিয়ে আনোয়ার উল্টা পাশ ফিরল। ওমারের মুখের দিকে তাকাল না। ধীরস্থিরভাবে উঠে বসল। বালিশের পাশে রাখা পাঁচকোল টুপিটা মাথায় দিয়ে ওমারের দিকে তাকাল।

জানতে চাইল—

'কী যেন বললে?'

'আমাদের চিল্লা দেওয়ার জায়গাটা বদলাতে হবে?'

'সেটা সম্ভব নয়। সবকিছু কাকরাইল থেকে ঠিক করা হয়েছে, এখন আর সেটা বদলানো যাবে না।'

'আমি এখানকার আমিরের সাথে কথা বলেছি, তিনি বলেছেন তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

ওমারের এই কথায় আনোয়ার রেগে যায়। যথাসম্ভব তার রাগ চেপে রেখে ওমারকে জিজ্ঞেস করে—

'ওমার, আমাদের জামাতের আমির কে? আমি না তুমি?'

'নিশ্চই তুমি।'

'তাহলে এখানকার আমিরের সাথে তুমি কেন কথা বলতে গেছ?'

'কারণ আমার মনে হয়েছে পেশোয়ার কিংবা ইসলামাবাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে যেখানে আমাদের জামাত নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'এখন পর্যন্ত তুমি তাবলিগে একটাও চিল্লা দেওনি, তোমার দিলের মধ্যে ইমানকে ফিট করে লেওনি, আমলে জিকিরে ফিকির নেই, খালি এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করো, তোমার মতলবটা কী?'

আনোয়ারের কথা শুনে রাগ না করে ওমার হেসে দেয়, বলে—

'একটা ব্যবসার আইডিয়া মাথায় এসেছে।'

একথা শুনে আনোয়ারের রাগ আরও বেড়ে যায়, বলে—

'ছি ছি ওমার, এই ছিল তোমার মনে, তুমি তাবলিগে এসে ব্যবসার ধান্দা করছ, আসলে আমারই ভুল। দেশে তোমাকে কমসে কম তিন চিল্লা দেওয়াইয়া তারপর এখানে আনা উচিত ছিল। তোমার নাফসের এখনও তাজকিয়া হয়নি, এই জন্য আখেরাত বাদ দিয়ে দুনিয়ার ধান্দায় তোমার মন ছটফট করছে। আর ব্যবসা মানে কি সেটাও ভালো জানি। এক লট পাকিস্তানি সালওয়ার-কামিজ কিম্যা গাউসিয়া মার্কেটে নিয়া বেচবা। মনে মনে এমন ধান্দা ছিল আমাকে আগেই তোমার বলা উচিত ছিল। লাইনে আরও অনেক ভালো ভালো বুজুর্গ লোকজন ছিল তাদের নিয়ে আসতাম। আমাদের খিত্তা ছেড়ে তোমার ভীনদেশিদের খিত্তাতে ঘোরাঘুরিতে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এখন দেখি সন্দেহই ঠিক হলো। যা-ই হোক, বলো তো শুনি কীসের ব্যবসা করবা?'

সেই তখন থেকে ওমারের মুখে হাসিটা লেগেই ছিল। আনোয়ার তার বুঝ এবং ভাবনা অনুযায়ী কথা বলছে, এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। যেহেতু ওমার তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না এটা নিয়ে প্রথম থেকেই তার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল, সেই ক্ষোভটা সুযোগ পেয়ে এখন পুরোটা ঝেড়ে দিল আনোয়ার। কিন্তু আনোয়ারের ক্ষোভে পানি ঢেলে দিয়ে তার 'কীসের ব্যবসা করবা' প্রশ্নের উত্তরে ওমার বলল—

'জান্নাতের।'

এটা শুনে আনোয়ারের রাগ আরও বেড়ে গেল, বলল—

'ওমার, তুমি ফাজলামো শুরু করলা আমার সাথে!'

ওমারের মুখের হাসিটা নিভে গেল, সিরিয়াস গলায় বলল—

'আল্লাহর কালাম নিয়ে ফাজলামো করার মতো সাহস এবং শক্তি কোনোটাই আমার নেই। আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ মোমিনের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।" আমি সেই বেচাকেনার বিনিময়টা নিতে চাই। তাই ব্যবসাটা যেখানে হচ্ছে সেখানে যেতে চাই, এত কাছে এসে ব্যবসাটা হাতছাড়া করতে চাই না।'

ওমারের বলার ধরন আর সিরিয়াস চেহারা দেখে দমে গেল আনোয়ার, জিজ্ঞেস করল—

'কোথায় হচ্ছে সেই ব্যবসা, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

এই প্রশ্নে ওমারের মুখে তার মিষ্টি হাসিটা আবার ফিরে এলো, বলল- 'আফগানিস্তান'।

মে, ১৯৯৮

খাইবার পাস, নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এই গিরিপথে পদচিহ্ন রেখে গেছে কত পর্যটক, বনিক, দস্যু, আক্রমণকারী আর বিজেতা সৈন্যবাহিনী। খাইবার পাস হলো প্রাচীন সিল্ক রোডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের ২৪৩০ কিলোমিটার সীমান্তকে যে লাইন বিভক্ত করেছে তার নাম ডুরান্ড লাইন। ডুরান্ড লাইন ছোঁয়া পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের এই প্রদেশ ছিল প্রাচীনকালের গান্ধারা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। হিন্দুকুশ পর্বতমালার ঢেউ খেলানো এই প্রান্তর হলো স্পিনগার। ইউরেশিয়া থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশের দরজা এই খাইবার পাস। এই পথ দিয়ে গেছে পারস্যের সম্রাট দারিউস, গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডার, মুসলিম যোদ্ধা সুলতান মাহমুদ গজনভী, মুহাম্মদ ঘোরী, মঙ্গল যোদ্ধা চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং, মোগল সম্রাট বাবর, ব্রিটিশ জেনারেল স্যার উইলিয়াম লকহার্ট। সাপের মতো পাহাড়ের গা প্যাঁচানো রাস্তার এই পাকিস্তানি অংশের নাম লান্ডি কোটাল। লান্ডি কোটাল থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে তোরখাম বর্ডার।

খাইবার পাস দিয়ে তোরখাম বর্ডার পোস্ট পার হলেই ওপারে আফগানিস্তান। তোরখাম থেকে আফগানিস্তানের জালালাবাদ দুই ঘণ্টার রাস্তা। তোরখামের বর্ডারে এসে থামল খালিদের নেতৃত্বে তিনটি বড় বাস। বাসগুলো যেন ট্রাক কেটে বানানো হয়েছে। রংবেরঙের ঝাঝর দিয়ে সাজানো বাসগুলোর ডেকোরেশন অনেকটা বাংলাদেশের রিকশার মতো। বর্ডারে পাকিস্তান অথরিটি খালিদের আসার খবর আগে থেকেই জানত, তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই ওরা বর্ডারের ফর্মালিটিস শেষ করতে পেরেছে। পাকিস্তান সরকার তালিবানদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। ওমারের মতো খালিদের এই যাত্রায় সঙ্গী হয়েছে প্রায় ত্রিশ জন বিদেশি। এরা খালিদের বয়ান শুনে উজ্জীবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তালিবানদের হয়ে লড়াই করার। বাসগুলো জালালাবাদ হয়ে কাবুল যাবে। জালালাবাদ শহরে ঢোকার মুখে একটি বড় তোরণে ঝোলানো ব্যানারে লেখা আছে ইসলামিক আমিরাত অফ আফগানিস্তানে স্বাগতম।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে কাবুল দখলের মধ্য দিয়ে তালিবানদের জয়যাত্রা শুরু হয়, এখন দেশের উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ ছাড়া পুরো আফগানিস্তানে চলছে

তাদের শাসন। উত্তরের ফারইয়াব, জাওজান, বলখ, কুন্দুজ, তাখার, বাদাখাশান, পাঞ্জশীর, কুনার ইত্যাদি প্রদেশগুলো জোট বেঁধে লড়ছে তালিবানদের বিরুদ্ধে। এক সময়ের দুর্ধর্ষ মুজাহেদ্দীন কমান্ডার আহমেদ শাহ্ মাসুদের নেতৃত্বে 'নর্দান অ্যালায়েন্স' নামে তালিবান বিরোধী জোট গঠন করে লড়ছে। জাতিসত্তায় তালিবানরা পশতুন। অন্যদিকে নর্দান অ্যালায়েন্স তাজিক, উজবেক, হাজারা, তুর্কমেন জাতিসত্তার লোকদের নিয়ে গঠিত। নর্দান অ্যালায়েন্সকে সাহায্য করছে ইরান, ইনডিয়া, তুরস্ক, তাজিকিস্তান, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, তুর্কমিনিস্তান। অন্যদিকে তালিবানদের সাহায্য করছে সৌদি আরব এবং পাকিস্তান।

জালালাবাদ ছেড়ে ওদের বাস চলছে কাবুলের দিকে। খালিদ নিজের বাসে রেখেছে বিদেশি মেহমানদেরকে। অন্য দুই বাসে তার আফগান তাবলিগ জামাতের লোকেরা, যারা আফগানিস্তানে ফিরে যাচ্ছে। খালিদ তার পাশের সিটে ওমারকে বসিয়েছে। ওমারের কথাবার্তা জানার পরিধি, ব্যক্তিত্ব আর জানার আগ্রহ তাকে খালিদের কাছে অন্য সবার চেয়ে আলাদা করেছে। ওমারের সাথে কথা বলে খালিদ জানতে পারে বর্তমান আধুনিক বিশ্বের ফ্যাশন মিউজিক সাহিত্য আর যা কিছু সে শিখেছে ইমামের কাছ থেকে। খালিদ ওমারের ইমামের বিষয়ে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বলেছে যুদ্ধ শেষ হলে সে ওমারের সাথে বাংলাদেশে গিয়ে ইমামের সাথে দেখা করবে।

ওমার হাসতে হাসতে বলেছে—

'আমি আমার ইমামের সাথে তোমার দেখা করিয়ে দেব, যদি তুমি তোমাদের আমিরুল মুমিনিন মোল্লা ওমরের সাথে আমাকে দেখা করিয়ে দাও।'

'কঠিন কাজ। তাকে জনসম্মুখে খুব কম দেখা যায়। তিনি প্রচার বিমুখ মানুষ। তার কোনো ছবি কোথাও নেই। আমি একবার এক ঈদের জামাতে এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম। একদল জানবাজ মুজাহেদ্দীন তাকে দুর্গের প্রাচীরের মতো পাহারা দিয়ে রাখে। দেখি তবুও চেষ্টা করব। তবে তুমি নিজেও কখনো তার দেখা পেয়ে যেতে পার। তিনি মাঝে মাঝে ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধাদের সাথে দেখা করতে আসেন, সেই ফ্রন্ট তখন ভীষণ উদ্দিপ্ত হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা খালিদ বলো তো, রাইওয়াইন্ডের তাঁবুতে একজনকে তোমাদের সমালোচনা করে বলতে শুনেছি, তালিবান তৈরি করেছে পাকিস্তান ইন্টার সার্ভিস ইন্টিলিজেন্স যাকে বলে আইএসআই, এটা কি সত্যি?'

প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে খালিদ বলল—

'এটা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। শোনো তোমাকে বলি কীভাবে তৈরি হয়েছে এই তালিবান। এটা একটা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনা। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে পরাজিত হয়ে চলে যাওয়ার আগে ক্ষমতা দিয়ে যায় তাদের তাবেদার নজিবুল্লাহ'র হাতে। সেই নজিবুল্লাহ সরকারের পতন হয় ১৯৯২

সালে। এরপর থেকেই আফগানিস্তানে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য। মুজাহেদ্বীনরা বিভিন্ন দল আর উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। দেশে কোনো আইন কানুন ছিলে না, চোর-ডাকাতদের হাতে সবাই জিম্মি ছিল। ঠিক এই রকম সময় কান্দাহারের প্রত্যন্ত সিঙ্গেসর এলাকার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া হাইওয়েতে একটা বিয়ের গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা হাইওয়ের পাশ্ববর্তী গ্রামে বিয়ের বরযাত্রীদের আটকে রাখে মুক্তিপণের জন্য। ঘটনাটা পাশের গ্রামের এক মাদ্রাসার শিক্ষকের কানে যায়। তিনি তখন তার ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র আর হালকা কিছু অস্ত্র নিয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ আর ধরাশায়ী করে উদ্ধার করেন লোকগুলোকে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটা খুবই চমকপ্রদ। একজন মাদ্রাসা শিক্ষকের এমন প্রতিরোধ ওই এলাকার সবাইকে সাহসী করে তোলে। সেই শিক্ষকের নাম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। তিনি জানতেন ডাকাতরা প্রতিশোধ নিতে সংঘবদ্ধ হয়ে আবার ফিরে আসবে, তাই তিনি আর বসে থাকলেন না। একটা মোটরসাইকেল ভাড়া করে জেলার সমস্ত মাদ্রাসায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে ডাকাতদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আহব্বান জানান। তার আহব্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। এই খবরে ডাকাত আর চেকপোস্ট বসিয়ে চাঁদা আদায়কারীরা সবাই ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালায়। ধীরে ধীরে এই প্রতিরোধ কান্দাহারের অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ধনী ব্যবসায়ী, কৃষক, মুজাহেদ্বীনদের অনেক নেতা, জনতা সবাই সমর্থন জানাতে থাকে, ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কান্দাহারের পতন হয়, মূলত পতন হয় মাদ্রাসার ছাত্রদের হাতে। তালেব মানে ছাত্র, সেটা থেকেই তালিবান। যথারীতি এর পরের লক্ষ্য কাবুল। আমরা প্রথম বছর কাবুল দখলে ব্যর্থ হই। দ্বিতীয় বছর ১৯৯৬ সাল থেকে পাকিস্তান আর্মি আমাদেরকে সহযোগিতা করে। পাকিস্তান আর আমাদের অভিন্ন স্বার্থ আমাদেরকে এক করেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমাদেরকে পাকিস্তান আর্মি তৈরি করেনি। আল্লাহর মদদে আমরা নিজেরাই তৈরি হয়েছি, আর যুদ্ধের প্রয়োজনে পাকিস্তানের সাহায্য নিয়েছি। পাকিস্তান তার স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থে আমাদেরকে সাহায্য করছে। এটা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক।'

কাবুল যত এগিয়ে আসছে ওমার ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। গভীর রাতের বুক চিরে বাসগুলো এগিয়ে যাচ্ছে কাবুলের দিকে। বাসের সবাই বিদেশি, ঘাড় ঘুরিয়ে ওমার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনায় সবার চোখ চকচক করছে। ওমারের পাশে বসে খালিদ নিজেও এখন নিশ্চুপ। আসার পথে জালালাবাদে তালিবান ক্যাম্পে ওরা এক ঘণ্টার যাত্রা বিরতি নিয়েছিল, সেখানে খালিদ তাদের জানিয়েছিল যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে উত্তরাঞ্চলের তিনটি জায়গায় মাজার-ই-শরিফ, কুন্দুজ আর বাগরামে। মাজার-ই-শরিফ আর কুন্দুজে আমরা খুব ভালো অবস্থায় আছি কিন্তু বাগরাম কাবুল থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে। আমরা

যুদ্ধটাকে রাজধানীর এত কাছে রাখতে চাই না। কাবুল যার, আফগানিস্তান তার। নর্দান অ্যালাইন্সের নেতা আহ্‌মেদ শাহ মাসুদ নিজে এখানে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। তার বেজ কাবুল থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে পাঞ্জশির উপত্যকায়। তাই বাগরাম ফ্রন্টে শক্তি বাড়াতে হবে। কাবুল নদীর তীরে আমাদের একটা ট্রেনিং ক্যাম্প আছে, সেখানে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং শেষ করে আমরা বাগরাম ফ্রন্টে চলে যাব। বাসের জানালার কাচটা ঘষা, তার উপরে-বাইরে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের হালকা আলো, কোনোকিছুই ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। কাবুল নদীর নামটা শোনার পর থেকেই রুশোর সাথে বুড়িগঙ্গায় কাটানো সময়গুলোর কথা তার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে আনোয়ারের মলিন মুখটা। আনোয়ার অনেক চেষ্টা করেছে তাকে ফেরাতে। শেষ পর্যন্ত বলেছে — 'ভাই সশস্ত্র জেহাদের চেয়েও নাফসের বিরুদ্ধে জেহাদটা বড়।'

ওমার আনোয়ারের হাত চেপে ধরে বলেছিল—

'আমি তোমার কাছে প্রমিজ করছি, আমি যখন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে থাকব তখনো আমার নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা জারি রাখব। আমি দুই ফ্রন্টে একসাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'

ওমার তর্ক করে না, কিন্তু যখন করে তখন তার যুক্তি দিয়ে আনোয়ারকে লা-জবাব করে দেয়। কাবুলগামী বাসে চড়ার আগে আনোয়ারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—

'থ্যাঙ্ক ইউ আনোয়ার, তুমি সাথে করে নিয়ে না আসলে আমার এই বিজনেসটা করা হতো না।'

একথা শুনে আনোয়ার ফিক করে হেসে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আনোয়ারের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল-

'এই চিঠিটা আমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিও।'

চিঠি হাতে নিয়ে কেন যেন আনোয়ার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

ওমার তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল—

'ইনশাআল্লাহ, আমাদের আবার দেখা হবে, এই পৃথিবীর কোথাও অথবা জান্নাতে।'

হিন্দুকুশ পর্বতমালার সাংলাক রেঞ্জে জন্ম কাবুল নদীর। পাহাড়ের অলিগলি খুঁজে খুঁজে নিজের পথ করে নেওয়া এক দুরন্ত বালক যেন। নদীর ঠিক পাড়েই ছোট ছোট টিলা আর ঝাড়-জঙ্গলের মাঝে একটা মাঝারি সাইজের খেলার মাঠ, তার পাশেই গুদামঘরের মতো একটা পুরাতন লম্বা টিনশেডের দালান। দেওয়ালে হাজার হাজার গুলির গর্ত, সিমেন্ট পলেস্তারার চলটা উঠে গেছে। মাঠের এক প্রান্তে সোভিয়েত আমলের একটা বিধ্বস্ত টি-৬২ ব্যাটল ট্যাঙ্ক তার ব্যারেলটা সেজদার মতো মাটি ছুঁয়ে আছে, দেখলে মনে হয় বারুদের গন্ধে বিরক্ত হয়ে এখন প্রাণভরে নিচ্ছে মাটির গন্ধ। জায়গাটা সোভিয়েত দখলদারদের ব্যারাক ছিল। এরপর মুজাহেদ্বীন গ্রুপ গুলবুদ্দিন হেক্মতিয়ারের বাহিনী ব্যবহার করত এই ব্যারাক, তাদের পর এখন তালেবানদের ট্রেনিং ক্যাম্প এটি।

ওমারদের বহনকারী বাসটা যখন এখানে এসে পৌঁছাল তখন রাত চারটা বাজে। নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন পথ ঘুরে আসতে হয়েছে। বাস তিনটি থামার সাথে সাথে তাদের ঘিরে ফেলল প্রায় বিশ-পঁচিশ জন সশস্ত্র তালেবান যোদ্ধা। খালিদকে দেখে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কমান্ডার টাইপের একজন পৌঢ় আরব এসে জড়িয়ে ধরল খালিদকে। খালিদকে দেখে সবাই খুব খুশি, বোঝা যায় এখানে খালিদ বেশ জনপ্রিয়। সবাইকে আরবি আর পশতু ভাষায় সালাম ও স্বাগত জানিয়ে নেওয়া হলো টিনশেডের ভেতরে। বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বোঝা যায়নি। একপাশে প্রচুর হালকা অস্ত্রসস্ত্রের মজুদ, কলার মোচার মতো শত শত আরপিজি অন্য পাশে জীর্ণশীর্ন কার্পেটের ওপর ঢালাও বিছানা। কেউ কেউ ঘুমিয়ে আছে কেউ কেউ নিজের শোয়ার জায়গায় গায়ের আফগানি চাদর বিছিয়ে নামাজ পড়ছে। ওমার ঘড়ির সময় দেখে বুঝল ওরা তাহাজ্জুদ পড়ছে। দিনে অনেক গরম হলেও এখন বেশ ঠান্ডা। আফগানিস্তানে ঢোকার আগেই ওমার আর বাকি বিদেশিরা পেশোয়ার থেকে আফগানদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সালোয়ার-কামিজ স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় পিরাহান তানবান কিনে নিয়েছিল। প্রায় একই রঙের চাদর এদের পোশাকেরই অংশ। সাথে থাকে পেশোয়ারী পাগড়ি। এই পোশাকে ওমারকে দেখতে আর বাংলাদেশি মনে হয় না। স্থানীয় আফগানদের সাথে ওরা সবাই মিশে গেছে। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে সবাই কার্পেটে গা এলিয়ে দিয়েছে। পৌঢ় আরব আর খালিদ বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে কিছু বলার জন্য দাঁড়াল। সবাই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। খালিদ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল-

'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এক মহান যোদ্ধার সঙ্গে, ইনি তাদের একজন যার হাত দিয়ে আল্লাহ এক মহাপরাক্রমশালী পরাশক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইনি নিশরের অধিবাসী, নিরাপত্তার কারণে তার আসল নাম এবং পরিচয় গোপন রাখা হচ্ছে, আমরা তাকে আদর করে ডাকি মেকানিক। কারণ এমন কোনো অস্ত্র নেই যা তিনি মেরামত করতে পারেন না। আগামী তিন সপ্তাহ আপনারা তার ছাত্র। আপনারা সত্যিই খুব সৌভাগ্যবান যে তার মতো একজন মহান যোদ্ধাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন।'

খালিদ কথা শেষ করে মেকানিকের দিকে তাকাল, তিনি পশতু ভাষাতে শুরু করলেন, খালিদ সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে।

'সবাইকে সালাম, সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহর, অসংখ্য দরুদ ও সালাম মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এবং তার পরিবার এবং সাহাবিগণের ওপর। আপনারা হলেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষ যাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ঘটনাক্রমে সুদূর আফগানিস্তানে টেনে এনেছেন জেহাদের জন্য। আল্লাহ আপনাদেরকে অনেকের মধ্য থেকে পছন্দ করে নিয়েছেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সব দেশের মুসলিমরা এখানে এসেছে, বিশেষ করে আরব বিশ্ব থেকে প্রায় ৩৫ হাজার আরব এসেছিল এই মাটিতে শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে। সেই দলে আপনারাও আজ সামিল হলেন। আমি আর কথা বাড়াব না, আপনারা ক্ষুধার্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের জন্য খাবার দেওয়া হবে, খাবার খেয়ে ফজর পড়ে আপনারা ঘুমাবেন। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকেই আপনাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে যাবে। জেহাদের ট্রেনিং-এর ৮০ ভাগ আপনারা ইতোমধ্যে অর্জন করে ফেলেছেন। সেটা কীভাবে? সেটা হলো এই যে আপনি আপনার জীবনটা আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন অর্থাৎ সেটা আপনি আফগানিস্তানে প্রবেশের পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চই আল্লাহ মানুষের নিয়ত দেখেন।

যে যোদ্ধা নিজেকে মৃত জেনেই যুদ্ধ করে, কার সাধ্য আছে তাকে হত্যা করার। তাই আপনি বাকি ২০ ভাগ অর্জন করবেন ট্রেনিং-এর মাধ্যমে, সেটাও খুব সোজা, আপনি শিখবেন কীভাবে শত্রুর মস্তক অথবা বুক বরাবর নিশানা করতে হয় আর কীভাবে রাইফেলটা ব্যবহার করতে হয়। বিশ্বাস করেন, শুধু এটুকু দিয়েই আমাদের সময়ে পৃথিবীর এক মহা পরাশক্তিকে আমরা তছনছ করে দিয়েছি।'

তিন সপ্তাহের ট্রেনিং-এর প্রথম সপ্তাহ কেটেছে প্রতিদিন দুর্গম পাহাড়ি পথে ২৫ কিলোমিটার হাইকিং করে। সবার সাথে একটা করে একে-৪৭ রাইফেল, আর ৭.৬২ মিলিমিটার বুলেটের ৫টা করে ম্যাগাজিন আর একটা করে রকেট প্রপেলড্ গ্রেনেডের ওয়্যারহেড। শরীরের সাথে বাঁধা আর্মার ভেস্ট অথবা পিঠে ঝোলানো র‍্যাকসেকে ভরে অ্যামুনেশন নিয়ে দৌড়ে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে

হয়েছে। সাধারণত একজন সৈন্য তার সঙ্গে ২১০ রাউন্ড গুলি রাখে, সেগুলো ভরা থাকে ৭টা ৩০ রাউন্ডের ম্যাগাজিনে। আফগানিস্তানের রুক্ষ পাথুরে মাটিতে চলাফেরার নিয়মকানুন আর শারিরীক ফিটনেস তৈরি করাই ছিল প্রথম সপ্তাহের ট্রেনিং। প্রচণ্ড কষ্টকর হলেও সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করছে সবকিছু রপ্ত করে নিতে। মেকানিকের কমান্ডে সবাই উঁচু-নিচু পাহাড়ে হাঁটছে আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করছে। পাঁচ কিলোমিটার পরপর এক ঘণ্টার জন্য থামছে, সেই সময়ে শেখানো হচ্ছে রাইফেলের প্রতিটি পার্টস্ সম্পর্কে আর কীভাবে পুরো রাইফেলটা পার্ট পার্ট করে খুলতে হয় আবার জোড়া লাগাতে হয়।

ফজরের নামাজ পড়ে ৪০ জনের গ্রুপটি মেকানিকের নেতৃত্বে রওনা দেয়, ২৫ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের খাঁজে একটা গোপন ক্যাম্পে পৌঁছে সেটা শেষ হয়। আহার এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার একই পথে ফিরতে হয়। সেই ফেরাটা হয় এশা ওয়াক্তে। পাকিস্তান আর্মির দেওয়া মিলিটারি বুটের ভেতরে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। সেনেগালের কাসিম ওমারের ফোস্কা ওঠা পায়ে প্রতিদিন এন্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে দেয়। ক্যাম্পে ফিরে ক্লান্তিতে ওমার ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে অন্ধকার টিনশেডের ভেতরে ঘুম ভাঙলে দেখে কেউ কেউ নফল নামাজ পড়ছে। ওজু গোসল করতে হয় ক্যাম্পের পেছনের কাবুল নদীর শীতল পানিতে। প্রায় ৫ ঘণ্টার গভীর ঘুমে ওমারের শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। বাইরে হালকা অন্ধকার, থরে থরে পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা ঘাট, সেখান থেকে নিচে নামলে নদী। ওজু করার আগে একটা পাথরের ওপর চুপচাপ বসে থাকে। গ্রীষ্মকালের প্রায় শুকিয়ে যাওয়া নদী, পাথরের ভেতর দিয়ে মৃদু শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে পানি। সে পানির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওমার। চরাচরের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে দূরপাল্লার হেভী আর্টিলারির ভোঁতা শব্দ। দিনের বেলা এই শব্দটা শোনা যায় না। কাবুল থেকে মাত্র ২৫ মাইল দূরে বাগরামে চলছে লড়াই। আর দুই সপ্তাহ পর ওমার সেখানে যাবে লড়তে।

দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে হাইকিংয়ের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক সুটিং রেঞ্জে শুরু হলো গুলি ছোড়ার শিক্ষা। ইতোমধ্যে ওমার শিখে ফেলেছে কীভাবে একে-৪৭ রাইফেলটিকে ম্যাগাজিন সহ ১০টা পার্টে খুলে ফেলতে হয়। জীবনের প্রথম ছোড়া গুলিটা লক্ষ্য ভেদ করতে পারেনি, কিন্তু ওমারের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে এক অজানা শিহরন। সারিবদ্ধভাবে ওরা বিভিন্ন ডাইরেকশনে গুলি ছুড়ছে, খই ফোটার মতো আওয়াজ পাথরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

তাদের পেছন থেকে মেকানিক অনবরত নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে, কখনো আরবিতে কখনো পশতুনে কখনো উর্দুতে কখনো ভাঙা ইংরেজিতে। ইংলিশের বাইরে হিন্দির সাথে মিল থাকার কারণে উর্দুটা সে সহজে বুঝতে পারছে। এখানে

সবাই যেহেতু ইংরেজি পারে না, পশতুর পাশাপাশি এখানে উর্দু কম-বেশি সবাই জানে, তাই ওমার সহজ হিসেবে উর্দুটা ভালোভাবে দ্রুত শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সে পশতুন ভাষাটাও শিখবে। খালিদ তাকে একটা পশতুন ভাষা শেখার ইংরেজি বই দিয়েছে।

ওমার একের পর এক ম্যাগাজিন শেষ করছে, তাকে গুলি ছোড়ার নেশা পেয়ে বসেছে। প্রতিটি রাউন্ডে শরীরে একটা ধাক্কা লাগে, সেই ধাক্কা ক্রমাগত চলতে থাকলে নেশা তৈরি হয়।

পেছন থেকে মেকানিক বলছে—

'তোমার গুলিতে লিখা আছে তোমার শত্রুর নাম, আর তোমার শত্রুর গুলিতে লেখা আছে তোমার নাম। তোমার শত্রুকে সম্মান করো। তার আগেই তুমি তার নামকে তার ঠিকানায় পৌঁছে দাও।'

এই ট্রেনিং প্রিয়ডে তারা পাঁচ-ছয় রকমের অ্যাসল্ট রাইফেল, হেভি মেশিনগান, এন্টি ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লাঞ্চার আরপিজি-৭, ২, ১৮ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছে।

মেকানিক বলেন, 'হে সম্মানিত মানুষেরা, তোমরা যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ শিখবে। তোমাদের প্রতিপক্ষরা বেতনের জন্য যুদ্ধ করে আর তোমরা যুদ্ধ করো জান্নাতের জন্য। তোমাদের জন্য মর্যাদা নির্ধারণ হয়ে গেছে, শুধু নিয়তটা পরিশুদ্ধ রেখ। তোমার শত্রুর প্রতি তোমার ব্যক্তিগত রাগ, ক্ষোভ, হিংসা, বিরাগ যেন না থাকে। তোমার শত্রুতা তোমার বন্ধুত্ব সব যেন হয় আল্লাহর জন্য।'

খালিদ অনেক ব্যস্ত, মূলত সে কাজ করে তালিবানদের প্রচারণা আর রিক্রুটমেন্ট নিয়ে। অসাধারণ বাগ্মিতা আর ইংরেজি জানার জন্য তাকে ভবিষ্যৎ তালিবান মুখপাত্র হিসেবে ভাবা হয়। তার বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে হিসাম হলেন মোল্লা ওমরের খুব কাছের লোক। ওমারদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার দুই দিন পর খালিদ এলো ক্যাম্পে। সবার সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর ওমারকে কাছে ডেকে হাত ধরে নিয়ে চলল নদীর ধারে। একটা বড় পাথরের ওপর বসে কয়েক মুহূর্ত ওমারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল। গত তিন সপ্তাহের অমানুষিক পরিশ্রমে ওমারের শরীর থেকে দশ কেজি ওজন কমে গেছে। শরীরে বাড়তি মেদ ঝরে চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে গেছে, চুল-দাড়ি সব পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ। আমূল বদলে গেছে ওমার। নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা এসব ওমারের মধ্যে ছিল না, কিন্তু এখন সে নিঃসংকোচে তার শত্রুর মাথা উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

ওমারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খালেদ ইমোশনাল হয়ে যায়। কণ্ঠে আবেগ নিয়ে বলে-

'তোমার মধ্যে আমি সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছি ওমার। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, আমার একটা ছোট ভাই ছিল বয়সে আমার দুই বছরের ছোট ছিল। রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধের শেষের দিকে সে শহিদ হয়ে যায়। রাইওয়াইন্ডে তোমাকে দেখার পর থেকে আমার কেন যেন বারবার আমার সেই শহিদ ছোট ভাইটার কথা মনে পড়ে। এমন না যে তার সাথে তোমার চেহারার মিল আছে, তোমার কোনোকিছুর সাথেই তার মিল নেই তার পরও তোমাকে দেখলে আমার বারবার তার কথা মনে পড়ছে। আমি অনেকদিন তাকে ভুলে ছিলাম। আমার কেন এমন হচ্ছে জানি না। পরে বুঝলাম এটা এই কারণে যে, আল্লাহ আমার অন্তরে তোমার জন্য ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন। জানি এইসব কথা আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে যায় না। আমরা আখেরাতকে দুনিয়ার ওপরে স্থান দিয়েছি। দুনিয়াতে তুমি আমার ভাই, ইনশাআল্লাহ আখেরাতেও তুমি আমার ভাই।'

খালিদের এসব কথায় ওমারের অন্তরটাও ভিজে ওঠে, খালিদের ঘনিষ্ঠ হয়ে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে তার হাত। মমতা আর ভালোবাসা জড়ানো কণ্ঠে বলে—

'নিশ্চই তুমি আমার ভাই, তোমার মতো ভাই থাকাটা গর্বের।'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে নীরবতা পালন করে খালিদ, এরপর ধীরে ধীরে তার মুখে পুরানো কাঠিন্য ফিরে আসে, ফিসফিস করে বলল—

'আমরা আগামীকাল রাতে বাগরাম যাচ্ছি। নর্দান অ্যালায়েন্স বাগরাম এয়ারফিল্ডের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ওরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে এয়ারফিল্ড দখল করতে, সেটা করতে পারলে কাবুলের ওপর ওদের নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। আমরা সেটা হতে দেব না, আমাদের শেষ যোদ্ধাটি জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা সেটা ছাড়ব না। আমাদের যোদ্ধারা হেরাত, হেলমান্দ, গজনি আর কান্দাহার থেকে আসছে দলে দলে। আমি নিজে আছি তোমাদের সাথে। তোমার জীবনের প্রথম জিহাদে লড়তে যাচ্ছ তুমি, সাহস রেখ, এমন পরিস্থিতিতে কী বলতে হবে দেখ আল্লাহ নিজেই আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন—

"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল" আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।'

জুন, ১৯৯৮

কাবুলের ২৫ মাইল উত্তরে পারওয়ান প্রদেশের জেলা শহর বাগরাম। প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশে ঢোকার সিল্ক রোড গেছে বাগরামের ভিতর দিয়ে। তাজিক জনগোষ্টির শক্ত ঘাঁটি পাঞ্চশির উপত্যকা আর ঘোরবান্ডের সংযোগে বাগরামের অবস্থান। মধ্য এশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর ঐতিহাসিক জনপথ এই বাগরাম। এই মুহূর্তে সবার নজর বাগরাম এয়ারফিল্ডের দিকে। বাগরাম এয়ারফিল্ড তৈরি হয়েছিল কোল্ড ওয়ারের সময় ১৯৫০ সালে। সোভিয়েত আফগান যুদ্ধের শুরুতেই এই বিমানবন্দর ছিল রসদ আর সৈন্য নামানোর জন্য অপরিহার্য। দুটি সোভিয়েত এয়ারবর্ন ট্রুপস ডিভিশন নামিয়ে তারা শুরু করেছিল তাদের দখলদারিত্ব। নর্দান অ্যালায়েন্স এখন মরিয়া এই কৌশলগত এয়ারফিল্ডটি দখল করতে। সেটা করতে পারলে কাবুলকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে।

সোভিয়েত আর্মির ফেলে যাওয়া পুরাতন ১০টা কার্গো ট্রাকে ৫০ জন করে তালেবান যোদ্ধা সঙ্গে ব্যক্তিগত অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রায় গাদাগাদি করে রওনা হয়েছে বাগরামের দিকে।

রাত ২: ৩০ মিনিট।

গভীর অন্ধকার। কোনো হেডলাইট জ্বালানো ছাড়াই চলছে ট্রাকগুলো। বাগরামের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে কামানের গর্জন। কনভয়ের ৫ নম্বর ট্রাকে আছে ওমার আর তার সঙ্গীরা। ড্রাইভারের পাশে বসে খালিদ রেডিও ওয়্যারলেস নিয়ে ক্রমাগত যোগাযোগ আর নির্দেশনা নিচ্ছে বেজ থেকে। খালিদের পাশের সিটে রেখেছে ওমারকে। খালিদ ওয়্যারলেসে বেশিরভাগ কথা বলছে আরবিতে। এতে বোঝা যায় আফগানিস্তানে আরবদের প্রভাব কতখানি। বাগরাম এয়ারফিল্ডের পশ্চিম প্রান্তে দুর্গম পর্বতশ্রেণি যেটা বামিয়ানের দিকে চলে গেছে, সেই পাহাড়ের সুরক্ষা নিয়ে আর্টিলারি বসিয়েছে আহমেদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বে উত্তরের জোট। আর্টিলারীর কাভার নিয়ে ফাস্ট লাইন অভ ডিফেন্সে বাংকার আর পাথরের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা কলামে পাহারা দিচ্ছে দুই হাজার তাজিক উজবেক আর হাজারা যোদ্ধা। আজকের রাতের আক্রমণটা হবে প্রথম ডিফেন্স লাইন ভেঙে দেওয়ার।

ওয়্যারলেসে সংকেত পাওয়ার পর খালিদ তার ড্রাইভারকে বলল, 'আমরা আর এক কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে যেতে পারব, এর বেশি গেলে ওদের লংরেঞ্জ আর্টিলারি এবং এম-৩০, ডি-৩০ হাউইটজারের নাগালের মধ্যে পড়তে হবে। পাহাড়ের ওপরে ওদের শক্তিশালী নাইট ভিশন টেলিস্কোপ আছে। কোনোভাবেই আমাদের মুভমেন্ট ওদেরকে বুঝতে দেওয়া যাবে না।'

ঠিক এক কিলোমিটার পর ফ্রন্ট লাইনের তালেবান যোদ্ধারা খালিদের ট্রাকের বহর থামাল, ট্রাক থেকে নেমে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সবাই হাঁটা শুরু করল মুল ব্যাটল গ্রাউন্ডের দিকে। কিছুক্ষণ পরপর আশেপাশেই কানে তালা লাগানো শব্দ নিয়ে আছড়ে পড়ছে কামানের সেল। মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে কেটে উড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সাইজের মর্টার শেল। ওরা যত ভিতরের দিকে ঢুকছে যুদ্ধের ভয়াবহতা তত বাড়ছে। এই ভয়াবহতার মধ্যে ওমারের কেমন যেন আনন্দ হচ্ছে। তার কেন যেন মনে হচ্ছে আজ রাতেই সে তার মহান প্রভুর সাথে মিলিত হতে যাচ্ছে। অন্ধকারের ভেতরে তার কয়েক কদম সামনে কাঁধের ওপর স্ট্রেলা-২ মিজাইল নিয়ে হাঁটছে জনাথন। ওমার ফিসফিস করে জনাথনকে ডাক দিতেই সে এসে ওমারকে এক হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল, ওদেরকে দেখে হেভি মেশিনগানের গুলির চেইন সারা গায়ে জড়িয়ে নেওয়া নুরান এসে চাপা উত্তেজিত গলায় বলো হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। তার সাথে সবাই কণ্ঠ মিলাল, ওদের সেই চাপা কণ্ঠ রিপিট হতে হতে লম্বা মিছিলের সামনে পেছনে ছড়িয়ে পড়ল। রাইওয়াইন্ডের তাবলিগের ইজতেমা থেকে যে ৩০ জন বিদেশি ট্রেনিং নিয়েছিল, তাদেরকে বিভিন্ন প্ল্যাটুনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওমার জনাথন আর নুরানকে নিজের দলে রেখেছে খালিদ। তালিবানদের ফ্রন্ট লাইনে আজ নতুন করে এক হাজার যোদ্ধা যোগ হলো। ওমার তাদের একজন। লম্বা খালের মতো ট্রেঞ্চে তালিবান যোদ্ধারা ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নেওয়া শুরু করল। কিছুক্ষণ পরপর হেভী মেশিনগানের কড়কড় আওয়াজে জানান দিচ্ছে প্রতিপক্ষরা প্রস্তুত আছে।

আজকের যুদ্ধটা কোনো গেরিলা যুদ্ধ নয়। দুটি পদাতিক সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ। আজ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫০টি দূরপাল্লার কামান অ্যাকশনে থাকবে। কামানগুলো রেঞ্জের মধ্যে এনে রাখা হয়েছে। সবগুলো কামান একসঙ্গে ফায়ার করা শুরু করবে প্রতিপক্ষের পাহাড়ের ওপরের বসানো কামানগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। কামানগুলো ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে সর্বাত্মক আক্রমণ। তালিবানরা অন্ধকারের আড়াল নিয়ে নিজেদের ডিফেন্স লাইন থেকে বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিপক্ষের বাংকারগুলোর ওপর।

কামানের আক্রমণ শুরুর জিরো আওয়ার নির্ধারণ হয়েছে ঠিক রাত ৪:১৫ মিনিটে।

এক সঙ্গে ৫০টা কামান প্রতিপক্ষকে হঠাৎ হতবিহ্বল করে দেবে কারণ এখানে যুদ্ধ হচ্ছে গত দেড় মাস ধরে, এই সময়ে এত কামান কখনো ব্যবহার করা হয়নি।

প্রতীক্ষার উত্তেজনায় সবাই টগবগ করে ফুটছে। বাঙ্কারে কেউ কেউ নামাজ পড়ছে কেউ সেজদায় পড়ে আছে কেউ আল্লাহর সাহায্য চেয়ে মুনাজাত করছে, কোরআনে হাফেজরা গুনগুন করে তেলাওয়াত করছে। ওমার পাথরের উপর তার রাইফেল পজিশনে রেখে নিশানায় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে যতদূর সম্ভব অন্ধকার ভেদ করার চেষ্টা করছে, তার অঙ্গুলটা ট্রিগারের ওপর জমাট বেঁধে আছে। জিরো আওয়ার হতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। ওমার সূরা আল আনামের ১৬২ নম্বর আয়াতটা বারবার বিড়বিড় করে তেলাওয়াত করছে "হে নবি আপনি বলুন, আমার নামাজ আমার কোরবানি, আমার জীবন আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

ঠিক ৪:১৫-তে একসাথে গর্জে উঠল ৫০টা কামান।

বিপরীত দিক থেকেও শুরু হলো গোলাবর্ষণ, বৃষ্টির মতো উড়ছে মর্টার সেল, হালকা, মাঝারি আর ভারী মেশিনগানগুলো একসাথে গুলিবর্ষণ শুরু করল। হঠাৎ করে যেন পৃথিবীতে কেয়ামত নেমে এলো। তালেবানদের ডিফেন্স লাইনের ওয়্যারলেসগুলোতে চিৎকারে চিৎকারে শোনা যাচ্ছে 'আল্লাহু আকবর' সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্কারগুলোতে সমস্বরে আল্লাহু আকবর তাকবিরে সবাই ফেটে পড়ছে। তালিবানরা সবাই বাংকার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। পাথরের আড়াল ধরে ধরে একদল এগিয়ে যাচ্ছে আরেক দল তাদের কাভার দিচ্ছে। অন্ধকারে হতাহতের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিপক্ষের ডিফেন্স লাইনে ঢুকতে হলে আনুমানিক তিনশ ফুটের দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। তালিবানরা জীবনপণ করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে ছুটছে সেদিকে। এমন ভয়াবহ হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে গেছে তাজিক আর হাজারা যোদ্ধারা, কেউ কেউ পিছু হটা শুরু করেছে কেউ কেউ প্রবল প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরের কামানগুলোর অর্ধেক থেমে গেছে তার মানে সেসব ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্লোজ রেঞ্জে শুরু হয়ে গেছে হাতাহাতি যুদ্ধ। কানে আসছে নিহতের শেষ চিৎকার আর আহতের যন্ত্রণার গোঙানির আওয়াজ। খালিদের প্ল্যাটুন একটা বাংকারকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু সেখান থেকে প্রবল প্রতিরোধ হচ্ছে ফলে খালিদ কোনো সুবিধা করতে পারছে না। চারিদিক থেকে লক্ষ লক্ষ রাউন্ড গুলি ছুটছে, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোতে হচ্ছে। আবার বেশি আগানো যাচ্ছে না, ওরা বাংকার থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ছে। বাংকারটার ভেতর থেকে তিনটা মেশিনগান ক্রমাগত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে কোনো ভাবেই তার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। ঘেরাও করতে গিয়ে এখন উল্টো

নিজেরাই ফাঁদে পড়ে গেছে। খালিদ একটি পাথরের আড়াল থেকে মাথাটা উঁচু করে পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেবে ভাবছে। তার যোদ্ধাদের নিষেধ করে দিয়েছে না আগাতে।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল আরপিজি কাঁধে নিয়ে বাংকারের দিকে ছুটছে এক তালেবান যোদ্ধা, সবাই বুঝে গেছে কী করতে যাচ্ছে সে, সবাই তাকে কাভার দেওয়া শুরু করল, খুব কাছাকাছি পৌঁছে সে চলন্ত অবস্থায় বাংকারের ছোট জানালা বরাবর আরপিজি ফায়ার করল। সেটা সরাসরি বাংকারের ভেতরে ঢুকে ব্লাস্ট করল। বিস্ফোরণের আলোয় খালিদ চকিতে চিনে ফেললো সে যোদ্ধাকে, বাংলাদেশের ওমার।

আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল খালিদ। ছুটে গেল মাটিতে পড়ে থাকা ওমারের দিকে, কিন্তু অক্ষত ওমার তার আগেই রাইফেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংকারের ভেতরে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ল অন্যরা। বেশ বড়সড় বাংকার প্রায় বিশ-পঁচিশ জন হাজারা যোদ্ধা ছিল বাংকারে। বেশিরভাগই মারা পড়েছে, জীবিতরা হাত উচিয়ে সারেন্ডার করছে আর উচ্চঃস্বরে কালেমা শাহাদৎ পড়ছে। একজন তালিবান যোদ্ধা চিৎকার করে বলছে—

'মেরে ফেল সবাইকে।'

সেটা শুনে ওমার তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে বলল—

'খবরদার এদের হত্যা করবে না, এরা মুসলিম।'

ওমারের কথার প্রতিবাদ করে আরেকজন তালিবান যোদ্ধা বলল—

'না, এরা মুসলিম না, এরা শিয়া।'

ওমার রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল—

'দেখছ না এরা কালেমা শাহাদাৎ বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে, এরা আমাদের মুসলিম ভাই, এদেরকে হত্যা কর না, বন্দি কর।'

আহত হাজারা যোদ্ধারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে এই বাদানুবাদ।

তালিবান যোদ্ধারা অস্থির হয়ে উঠেছে তাদের হত্যা করার জন্য।

ঠিক তখনই বিধ্বস্ত বাংকারের ভিতরে এসে পড়ল একটা মর্টার সেল। সবাই লাফ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেও ওমারের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটা প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কা ওমারের স্নায়ুকে অসার করে দিল। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার মনে হলো তার মুখের ভেতরটা ভরা নোনা রক্ত।

পাঘমান, কাবুলের পশ্চিমের শহরতলী। হিন্দুকুশ পর্বতমালার ঠিক পায়ের নিচে। এখানে পাহাড় আর সবুজ গাছপালা ছাওয়া গ্রামটার নাম আদমখেল্ কালা। শান্ত সবুজ গ্রামটাতে বসে বোঝার উপায় নেই এই দেশের অন্যপ্রান্তে কী ভয়াবহ মরণপণ যুদ্ধ চলছে। কৃষি এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। পাঘমানের ঝরনা আর হিন্দুকুশের বরফগলা পানিই মূলত কাবুল নদীর প্রাণ। উর্বর জমিতে প্রচুর কাঠবাদাম, পেস্তাবাদাম, চিনাবাদাম, ডুমুর ব্লুবেরি, আঙুর আর আপেলের বাগান এখানে। সকাল সকাল একদল চলে যায় চাষবাসে অন্যরা কাজের জন্য চলে যায় কাবুল শহরে। তখন আদমখেল্ কালা গ্রামটা আরও নীরব হয়ে যায়। এই সবুজ নীরবতাটুকুর জন্যই খালিদের বাবা আব্দুল্লাহ পাঘমানের এই উপত্যকায় জমি কিনে বসবাসের জন্য বাড়ি করেছিলেন। পাহাড়ের ঢালে মাটি আর কাঠ দিয়ে তৈরি দোতলা বাড়ি। বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতরে আরও কিছু ঘর আর তার পাশে বড় বড় কয়েকটি আপেল আর আকাশ ছোঁয়া ফির গাছ, বাড়ির যেকোনো অংশ থেকে পূর্বমুখি হলে দেখা যায় পাঘমানের ঢেউখেলানো পর্বতমালা ছাড়িয়ে দূরে বরফের সফেদ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুরুগম্ভির হিন্দুকুশ।

খালিদের দুই মা, একজন আরব আর একজন পশতুন, তাদের ঘরে মোট ৯ ভাই-বোন। এ বাড়িতে পুরুষ বলতে খালিদের ছোট দুই ভাই যাদের বয়স চার ও ছয়। গায়ের রঙের সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়া বোঝার উপায় নাই কে কোন মায়ের সন্তান। সবাই মিলেমিশে থাকে। খালিদ বাড়িতে ফেরে মাসে দুই-একবার, তিন-চার দিন থেকে চলে যায়। তালিবান আন্দোলনে খালিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের রিফিউজি ক্যাম্পের মাদরাসাগুলো থেকে দলে দলে ছাত্ররা যাচ্ছে কান্দাহারে, কাবুলে, তারা তিন সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে চলে যাচ্ছে ফ্রন্ট লাইনে। খালিদ পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মাদরাসাগুলোতে যেয়ে জেহাদের বিষয়ে তার অসাধারণ বাগ্মিতার দ্বারা ছাত্রদেরকে উজ্জিবিত করে, সেখান থেকেও প্রচুর ছাত্র যাচ্ছে আফগানিস্তানে। এছাড়াও চেচনিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কেমিনিস্তান এবং আরব ভূমি থেকে যারা আসছে তাদের ট্রেনিং সমন্বয় করার কাজও তাকে করতে হয়। খালিদের বাবা থাকে কান্দাহারে, তালিবান কমান্ড কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ পদে, আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের কাছের মানুষ। কতটা কাছের সেটা নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি কখনো পরিবারের কাছেও প্রকাশ করেন না।

এ বাড়ির বড় মেয়েটার নাম আসমা। জালোযাই আফগান রিফিউজি ক্যাম্পে স্কুল শেষ করে ভর্তি হয়েছিল পেশোয়ারের রুফাইদাহ্ নার্সিং কলেজে, দুই বছরের কোর্সের এক বছর শেষ করার মধ্যেই তালিবানরা কাবুল দখল করে নেয়। নিরাপদ কাবুলে ফিরে আসার জন্য তার বাবা তাকে চিঠি লিখলে সে কিছুদিন থাকবে বলে ছুটি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আসমা আর পেশোয়ারে ফিরে যেতে পারেনি।

বাগরাম যুদ্ধে উত্তরের জোট পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেছে। এই জন্য তালিবানদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ২৬৭ জন তালিবান যোদ্ধা শহিদ হয়েছে। বাংকারে মর্টার বিস্ফোরনের পরপরই খালিদ ছুটে এসেছে। মৃত হাজারা আর তালিবান যোদ্ধাদের মধ্যে রক্তাক্ত ওমার পড়ে ছিল। মৃত ভেবে ওমারের কপালে শেষ চুম্বন দেওয়ার জন্য মাথাটা তুলেছিল ঠিক তখনই খালিদ দেখতে পেয়েছিল ওমারের চোখের পাতাটা খুব মৃদু ছন্দে কাঁপছে। তখন বিদ্যুৎ খেলে গেছে খালিদের গায়ে।

সবাই ধরাধরি করে তাকে বাংকার থেকে বের করেছিল। ফ্রন্ট লাইন থেকে ফিল্ড হাসপাতাল ১৩ কিলোমিটার দূরে। সেখানে পৌঁছানোর আগে তার রক্ত পড়া বন্ধ করতে হবে, তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর লম্বা দড়ির মতো কেটে সাইজ করে সেটা দিয়ে যতটা সম্ভব ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিল। ওয়্যারলেসে আগেই একটা পিকআপ রেডি রাখতে বলেছিল। ওমার সহ আরও তিনজন গুরুতর আহতকে পিকআপে তোলা হয়েছে, যাদের একজনের দুই পা উড়ে গেছে, একজনের ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে, অন্যজনের চোয়াল ঝুলে আছে। ফিল্ড হাসপাতালে পৌঁছার পর তিনজন আর বেঁচে নেই। ওমারের চোখের পাতা তখনো তিরতির করে কাঁপছে। ছাদ উড়ে যাওয়া একটা দোতলা ভবনের নিচতলায় অস্থায়ীভাবে এই হাসপাতালটা করা হয়েছে, ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। এটা একটা দোকান ছিল আগে। কোনো ডাক্তার নেই। আছে পাকিস্তান আর্মির একজন প্যারামেডিক। যন্ত্রের মতো কাজ করে। ওমারের সারা গা থেকে ৩৭টি স্প্লিন্টার বের করে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে সেলাইফোড় করে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় যেটুকু জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ছিল সেসব দিয়ে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে কাগজ বিছানো ফ্লোরে শুইয়ে রেখেছে। মেডিক জানে এই লোকটা আর বড়জোড় আধাঘণ্টা বাঁচবে। সে শুধু তার দায়িত্বটুকু সেরে দিয়েছে। আগামী দশ মিনিটের মধ্যে যদি একে কাবুলের দাউদ খান মিলিটারি হসপিটালে নেওয়া যায় তাহলে অলৌকিক কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। আফগানিস্তানের যুদ্ধে মৃত্যু কোনো বড় বিষয় না। এখানে সবাই মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করে। মৃত্যুর পর্দাটুকু সরলেই চির সুখের জান্নাত বলে মনে করে তালিবানরা। ওমারের সারা গায়ে সাদা ব্যান্ডেজে মোড়ানো। তাকে দেখতে মমির মতো মনে হচ্ছে। মেঝেতে নিশ্চল পড়ে আছে। ২০ মিনিট পর মেডিক একবার এসে দেখে গেছে, মরে গেছে কি না। ওমারের ঠান্ডা হাত টিপে টিপে পালস্ এর রেট দেখে তার ভ্রু কুঁচকে গেছে। এই লোক এখনও বেঁচে আছে কীভাবে!

ভয়াবহ যুদ্ধে উত্তরের জোটকে বাগরাম থেকে ঠেলে চারিখারে কোণঠাসা করে রেখেছে তালিবানরা। কাবুলকে নিরাপদ করে আপাতত ডিফেন্সিভ পজিশনে আছে তারা।

পুরা ২৪ ঘণ্টা পর খালিদ এসেছে ফিল্ড হাসপাতালে ওমারকে দেখতে। সাথে এসেছে তার সতীর্থ সব মুজাহেদ্দীনরা। বাগরাম যুদ্ধের একটা সংকটময় মুহূর্তে ওমারের দুঃসাহসীক ভূমিকা তাদের অবস্থানের যুদ্ধের গতি পাল্টে দিয়েছিল। ওমারের নাম সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। প্রায় শখানেক তালিবান যোদ্ধা হসপিটালে এসেছে ওমারকে দেখতে। তাদের বেশিরভাগই ওমারকে শেষবারের মতো দেখার জন্য এসেছে। মেডিকের কাছে ওমারের অবস্থা শুনে বিস্ময়ে আল্লাহু আকবর বলে তাকবির দিয়েছে সবাই। ওমার এখনও বেঁচে আছে। সবাই মিলে দ্রুত কাঁধে করে নিয়ে ল্যান্ড ক্রুজারে তুলে ছুটল কাবুলের দাউদ খান মিলিটারি হসপিটালের দিকে।

অক্টোবর, ১৯৯৮

কাবুলে এখন শরৎকাল।

পাঘমানের বাতাসে শীতের আগমনি গন্ধ। সাইবেরিয়ার হাঁসগুলো শুরু করেছে দূরপাল্লার উড়াল। ওরা পামির মালভূমির ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে তিয়ানশান, কারাকোরাম, কুনলান পর্বতমালা পেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমুদরিয়ার জলে, সেখানে দুদন্ড জুড়িয়ে নিয়ে আবার দেয় উজার উড়াল, উড়তে উড়তে হিন্দুকুশ, হিমালয় কাঞ্চনজঙ্ঘা পেরিয়ে পলিমাটির বাংলাদেশ। বুক চিড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে ওমারের। কয়দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে। মনে মনে পাখিগুলোর সাথে কথা বলে ওমার, 'ও পাখি বাংলাদেশে খবর দিও, আমি আছি পাঘমানের আদমখেল্ কালা গ্রামে।'

পাখিরা ওমারের এসব কথা শুনতে পায় না। একটা দমকা বাতাস এসে নাড়িয়ে দিয়ে যায় ফির গাছের চিকন চিকন পাতাগুলো। সবুজ গাছগুলো শেষবারের মতো গায়ে মেখে নিচ্ছে রোদের সোনালি আলো। এরপর ওরা দিন গুনতে থাকবে ঝরে পরার। শীত আর তুষার ঝড়ের দীর্ঘ রাতে তাদের পাতাহীন শাখা-প্রশাখায় শিস্ তুলে বয়ে যাবে বিরহী বাতাস।

দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আসরের আজান। যে ঘরটার বারান্দায় ওমার বসে আছে সেটা পাহাড়ের ঢালে। পূর্ব দিকে বাধাহীন দৃষ্টি চলে যায় হিন্দুকুশ পর্বতমালা ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমের আকাশে। ওমার জাগতিক সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে নিয়ত বাঁধে আসরের নামাজের। চেয়ারে বসে বসে ইশারায় রুকু সেজদায় আল্লাহকে স্মরণ করে। নামাজ শেষে বাবা-মা'র জন্য দোয়া শেষে শুধু এটুকুই বলে, 'আমার জীবন আমার মৃত্যু বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।'

ওমারের কোনো ঘড়ি নেই, কিন্তু সময় বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। আজানের সময় ধরেই তার সময়। জাগতিক ঘড়ির সময় ধরে করার মতো কোনো কাজ নেই তার। তার জীবন এখন পুরোটাই আখেরাতের জীবন। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের পর্দার রহস্য অনেকখানি সে এখন জেনে গেছে। এই ক্ষুদ্র নশ্বর জীবন নিয়ে তার আর কোনো পরওয়া নেই। মিলিটারি হসপিটালের ডাক্তার একদিন তাকে বলেছিল 'তোমার জীবন ফিরে পাওয়া দেখে আমার ইমান বেড়ে গেছে। মানুষ আহত হবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কিন্তু তাঁর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত মানুষ নিহত হবে না।'

১৫ দিন কোমাসহ টানা তিন মাস হসপিটালে থাকার পর ডাক্তাররা বলেছে আপাতত তার বিপদ কেটে গেছে এখন তার বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। হসপিটালে ধারণক্ষমতার বহুগুন বেশি রোগী, বেশিরভাগই ফ্রন্ট লাইন থেকে আসা তালিবান যোদ্ধা। একটা সিট ছেড়ে দিলে উপকার হয় একজন আহত রোগীর।

মিশরীয় ডাক্তার মজা করে বলেছে, 'তুমি ভালো হয়ে গেছ, বাড়ি চলে যাও।'

ওমার উত্তরে বলেছে-

'তা হলে আমাকে ফ্রন্ট লাইনে পাঠিয়ে দাও।'

'ফ্রন্ট লাইনে কারো বাড়ি হয় নাকি?'

'জান্নাতে যে বাড়ি কিনে রেখেছে, তার তো ফ্রন্ট লাইনেই যাওয়া উচিত।'

'জান্নাতে তোমার বাড়ি এখনও রেডি হয়নি, তাই আল্লাহ তোমাকে এ যাত্রা কাবুলেই রেখে দিলেন। কাবুলে তোমার কোনো আত্মীয় স্বজন নেই?'

'আমার ভাই আছে।'

'কী নাম তার?'

'খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হিসাম আল হিজাজী।'

ধীরে ধীরে ওমারের সারা শরীরের ক্ষতগুলো শুকাচ্ছে। তার এক পায়ের ভেতরে লোহার পাত লাগানো। হাড্ডির ভেতরে বোমার স্প্লিন্টার ঢুকে ছিল। সেটা বের করতে গিয়ে পায়ের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নিয়মিত ব্যান্ডেজ বদলানো আর হাই পাওয়ার এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন নেওয়া আর পরিচর্যা ঠিকমতো না হলে যেকোনো সময় ইনফেকশন হয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ করে খালিদ এসে বলল—

'বাড়ি চলো।'

'রাইওয়াইন্ডে স্বদেশি বন্ধু আনোয়ারকে ফিরিয়ে দিলাম বাড়ি যাব না বলে, এখন আমাকে বাড়ি যেতে বলছ কেন?'

'আল্লাহ তোমাকে অনেক ভালোবাসেন ওমার। তোমার জন্য এই আফগানিস্তানেও তিনি বাড়ি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আমাদের বাড়িটাই তোমার বাড়ি। তুমি শুধু আফগানদের নিষ্ঠুরতা দেখেছ, এখন তাদের মেহমানদারি দেখবে। তুমি পাঘমান যাচ্ছ, আমাদের বাড়িতে, আমার বোন আসমা, নার্সিং কলেজের স্টুডেন্ট, পড়াশোনা শেষের দিকে, আশা করছি সে তার ভাইয়ের নার্সিংটা ঠিকমতো করতে পারবে।'

'মানুষের তাকদিরটা গল্পের মতো।'

গরম পানিতে কাচের সিরিঞ্জ আর নিডিলটা পরিষ্কার করতে করতে কথা বলে আসমা। প্রতিদিন আসরের আজানের বিশ মিনিট পর আসমা আসে ওমারকে ইনজেকশন দিতে। আসমা যতক্ষণ রুমে থাকে ততক্ষণ সে তার চোখটা বেশিরভাগ সময় মাটির দিকে নামিয়ে রাখে। ওমারের গাল ভেদ করে একটা স্প্লিন্টারের টুকরা আটকে ছিল মুখে। মুখের ভিতরের ক্ষত আর গালের সেলাই করা অংশটায় টান পড়ে বলে বেশি কথা বলতে পারে না। আসমার মমতা মেশানো যত্ন নার্সিং এসব দেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর ভরে ওঠে।

'আমি যদি নার্স না হতাম, আর খালিদ যদি আমার ভাই না হতো, আর আপনি যদি পাকিস্তানে না আসতেন, আর আফগানিস্তানে যদি জেহাদ না হতো, কতগুলো ঘটনা ঘটতে হয়েছে আপনাকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসতে। যেন কেউ একটা গল্প লিখে রেখেছে আর আমরা ঘটনাটা পড়ছি। পড়া ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ নেই। এই গল্পের কোনো পরিবর্তন নেই। গল্পটা এমনই হওয়ার কথা ছিল। এটাই তাকদির।'

এন্টিবায়োটিকের ছোট শিশির ভেতরে সিরিঞ্জ দিয়ে ডিস্টিল ওয়াটার ঢুকিয়ে একহাতে শিশি ধরে অন্য হাতের তালুতে বাড়ি দিয়ে দিয়ে ভিতরে পাউডারগুলো ভালোমত পানিতে গুলিয়ে নিচ্ছে আসমা।

'আমি অবাক হই ভেবে, এই সময় পড়া শেষ না করে আমার কাবুল আসার কথা ছিল না।'

এন্টিবায়োটিকের ছোট শিশি থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে ঔষধ টেনে নিয়ে সেটা সতর্কতার সাথে রাখল একটা চীনামাটির বাটিতে। তারপর একটা ফিতা দিয়ে ওমারের বাম হাতের কনুইয়ের ওপরে বেঁধে হাতের রগ খুঁজে বার করল। এবার সিরিঞ্জটা মুখের ওপর ধরে হালকা চাপ দিয়ে ভিতরের বাতাসটুকু বের করে দিল, তাতে কিছুটা সাদা তরল বের হয়ে আসল। তুলা দিয়ে সুইয়ের মাথাটা মুছে যখন সেটা ওমারের ফুলে ওঠা রগে ঢুকাতে যাবে ঠিক তখন ওমার সরাসরি তাকাল আসমার চোখের দিকে, এক ঝলক তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিল।

আসমা রগের ভিতরে সুইটা ফুটাতেই ওমার উহ্ করে উঠল। গত দুই মাস ধরে ওমারকে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন দিচ্ছে আসমা, ওমার কখনো ব্যথা পেয়ে উহ্ বলেনি।

'আজই প্রথম ব্যথা পেলেন বুঝি?'
ওমার ছোট্ট উচ্চারণে বলল—
'হ্যা।'
মুচকি হেসে আসমা বলল,
'আল্লাহ আপনাকে একটু করে শাস্তি দিলেন।'
কিছুটা অবাক হয়ে ওমার জানতে চাইল,
'কেন শাস্তি দিলেন?'
'কারণ আজ প্রথম আপনি সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন।'

একথা শুনে ওমার আর তার গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারল না, মাটির দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে দিল, ঠিক তখনই তার গালে টান লাগল, আবার উহ্ করে গাল চেপে ধরল। এটা দেখে আসমার মুখে লেগে থাকা মুচকি হাসিটা আর একটু বিস্তৃত হলো, আর বলল, 'এবার এটা হাসির জন্য শাস্তি।'

অসুস্থ ওমারের দৈনন্দিন রুটিনগুলো আজান কেন্দ্রিক। দূরের মসজিদের এশার আজান দেওয়ার সাথে সাথে ওমার নামাজ পড়ে নেয়। এর কিছুক্ষণ পর আসমা তার জন্য ঔষধ আর রাতের খাবার নিয়ে আসে। সাথে করে নিয়ে আসে একটা রেডিও। ওমার প্রতিদিন রাত ৮ টার ইংরেজি খবর শোনে। তালিবানরা কাবুলের ক্ষমতা দখলের পর রেডিও কাবুলের নাম বদলে রাখে 'শরিয়াত ঘাঘ' বা ভয়েস অভ শরিয়া। প্রতিদিনের আফগান যুদ্ধের খবর আর তাদের বিজয়ের খবরগুলো ফলাও করে প্রচার করে রেডিও। খবর শুনতে শুনতে ওমারকে রাতের খাবার পরিবেশন করে আসমা। ওমার কোনো শক্ত খাবার খেতে পারে না, বিভিন্ন সবজির সুপ আর তার সাথে খাসি বা গরুর পায়ার নির্জাস মিশিয়ে তার মধ্যে টুকরো টুকরো রুটি ছেড়ে দিলে সব মিলিয়ে এক ধরনের সুপ তৈরি হয়, ওমার একটু একটু করে ধীরে ধীরে চামচ দিয়ে খাবারটা খায়। এই খাবারটা যেমন শক্তিবর্ধক তেমনি সুস্বাদু। তিনবেলা তাকে এই একই খাবার খেতে হয়। আসমা মাঝে মাঝে স্বাদটা চেঞ্জ করার জন্য মাংসের বদলে মাছ দেয়।

আসমা খালিদের সৎ বোন। আসমার মা পশতুন। ওমারের জন্য এই রান্নাটা করে আসমার মা, আসমা তার মাকে সাহায্য করে। খালিদদের বাড়ির কম্পাউন্ডের এক পাশে আলাদা ঘরটা তৈরি করা হয়েছে মেহমানদের জন্য। ঘরটা মূলত মূল বাড়ি থেকে আলাদা, তাই ওমারের অবস্থান রক্ষণশীল আফগান পরিবারে কোনো প্রভাব পড়ে না। আসমা নার্সিংটা তার পেশাদারিত্বের জাগয়া থেকে দেখলেও ওমারকে তারা নিজেদের পরিবারের অংশ মনে করে, কারণ খালিদ তাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধে ওমারের সাহসীকতা আর আত্মত্যাগ তাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। আসমা কাজ করে প্রফেশনাল নার্সের মতো। কিন্তু সেখানে

মমতা। এক আজনবি, দূর দেশ থেকে এসেছে তাদের দেশে, তাদের বাবা ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে, এই যুদ্ধে তার জীবনটা চলে যেতে পারত। ওমারের শরীরের ক্ষতগুলো দেখলে কোনোভাবেই কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে, এর পরেও মানুষ বাঁচতে পারে। আসমা বুঝতে পারে এই মানুষটাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। এক ঝলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কী অদ্ভুত পবিত্র আর মায়া ভরা দৃষ্টি লোকটার। আসমার ভেতরে কী যেন একটা অনুভূতি হয়। একটা অপরিচিত অনুভূতি, যা আগে কখনো হয়নি। সেই রাতে তার বারবার ঘুম ভেঙে গেছে, সে বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে বারবার ক্ষমা চেয়েছে, ক্ষমা চাইতে চাইতে তার খেয়াল হলো সে যতটা না নিজের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তার চাইতে বেশি সে আজনবি লোকটার জন্য কল্যাণ চেয়েছে, তার সুস্থতা চেয়েছে, দীর্ঘ হায়াত চেয়েছে।

বিশ্বাসী পুরুষরা তাদের দৃষ্টি নত রাখে। ওমার সব সময় সেটাই করে, এটা আসমা জানে, কিন্তু এই লোকটা যেন জাদুকর, থলের ভীতরে লুকিয়ে রাখে গোপন মন্ত্র। এ কারণেই যেন চোখটা লুকিয়ে রাখে, গত দুই মাসের মধ্যে একবার মাত্র সরাসরি তাকিয়েছে চোখে, তাতেই সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। এখন ইনজেকশন দিতে গেলে হাত কাঁপে আসমার। হাত কাঁপা বন্ধ করার জন্য তাকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। একথা সে কথা বলে দৃষ্টি ঘুরাতে হয়। তাই আসমা সুঁই ফোটানোর আগে জিজ্ঞেস করে, 'শুনেছি আপনাদের দেশে নাকি অনেক নদী? আমার নদী দেখতে অনেক ভালো লাগে। কয়টা নদী আছে আপনাদের দেশে?'

ওমারের নজর মাটির দিকে থাকলেও, সে খেয়াল করে গত কয়েকদিন ধরে আসমার হাত কাঁপছে, এতটা কাঁপছে যে সে ঠিকমতো রগের ঠিক জায়গায় সুইয়ের মাথা বসাতে পারছে না।

কিছু একটা ওমারেরও হয়েছে।

সেটা এক ঝলকের একটা দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কোনো মানুষের চোখ এত সুন্দর হতে পারে!

এটা যেন ওমারের জীবনে একটা আবিস্কার।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ১৯৮৫ সালের জুন সংখ্যার প্রচ্ছদে একটা সবুজ চোখের আফগান শরনার্থী তরুণীর ছবি ছেপে সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দেয়, ঢাকায় বসে সেই ছবি দেখে মুগ্ধ ওমারের সেটাই ছিল প্রথম কোনো আফগান মেয়েকে দেখা। আর আজ সেই একই রকম একটা সবুজ চোখের মেয়ে তার হাতে সুঁই ফোটাতে চেষ্টা করছে, কী এক অজানা কারণে তার হাত কাঁপছে, সেটা দেখে এখন একটু একটু

করে কাঁপছে ওমারের বুক। ওমার তার হাতের দিক থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তরে বলে—

'কয়টা না, আমাদের দেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৮০০টি।'

ওমারের রগ থেকে সিরিঞ্জের সুঁই বের করে সেখানে তুলা চেপে ধরে সরাসরি ওমারের মুখের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে বলে, '৮০০ টি নদী!'

ওমার ঘাড় ঘুরিয়ে আসমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে বলে, 'হ্যাঁ'।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে দুইজোড়া চোখ। তারপর চোখ সরিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওমারের বিছানা গোছাতে গোছাতে বলে—

'কয়েকটা নদীর নাম বলেন তো শুনি।'

ওমার বলে—

'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলি, শীতলক্ষ্যা।'

'ইস কী সুন্দর সুন্দর নাম। নিশ্চয়ই সবগুলো নামের অর্থ আছে, আচ্ছা একটা নামের অর্থ শুনি।'

ওমার বলল—

'কর্ণফুলি, মানে কানের দুল।'

বড় বড় চোখ করে বিস্ময় নিয়ে বলল—

'কত্ত সুন্দর নাম! কবিতার মতো। আপনাদের দেশের একজন কবির নাম পড়েছিলাম, কী যেন ঠাকুর।'

ওমার হাসে।

পাল্টা প্রশ্ন করে—

'আপনাদের দেশে কয়টা নদী আছে?'

এই প্রশ্নে আসমা নামতা পড়ার মতো করে আঙুলের কড়ে গুনে গুনে বলল—

'কাবুল, হেলমান্দ, হারি, আরগান্দাব, কুনার, পাঞ্চ, মুরঘাব, গোমাল, ফারাহ, ককচা, পাঞ্জশির, ওয়াখান, পিচ, আলিনগার, খুররাম, মুসা কালা এবং আমু দরিয়া।'

ওমার বলল—

'আপনাদের দেশে আসার আগে আমু দরিয়ার নাম পড়েছিলাম বইতে, ল্যাটিন ভাষায় এই নদীর নাম অক্সাস। আর আমাদের দেশেও নদীকে দরিয়া বলে।'

ওমারের কাছে নতুন কিছু শুনলে কিশোরীর মতো চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে আসমা।

বলে—'আপনাদের দেশে ফারসি ভাষা গেল কীভাবে?'

'কেন আপনি জানেন না, আপনাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদের ভারত উপমহাদেশ শাসন করেছে, আপনি নিশ্চই মোগল সম্রাট বাবরের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, তিনি তো আমাদের সম্রাট ছিলেন।'

'আমাদের বাংলাদেশকেও আফগানরা শাসন করেছে, আমাদের ইতিহাসের বইতে এসব আমরা স্কুলে থাকতেই পড়ি। মোগল তুর্কি ছাড়াও বাংলাকে ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৬ সাল মোট ৩৮ বছর শাসন করেছে আফগান শাসকরা। তার মধ্যে একজন বিখ্যাত আফগান শাসক ছিলেন শেরশাহ্। তাঁর নামে আমাদের ঢাকায় এখনও একটা রাস্তার নাম আছে শেরশাহ্ রোড, একটা জেলার নাম আছে শেরপুর।'

মিষ্টি হেসে আসমা বলে—

'আমি এত জানি না, আপনি অনেক জানেন, মাশাল্লাহ।'

'না, আমি বেশি জানি না, তবে আমার জানতে ভালো লাগে।'

'আমারও জানতে ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েদের জন্য এখানে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে। আব্বুকে বলেছি, আব্বু মুসলিম নরনারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, কিন্তু তোমরা কেন মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছ। আব্বু বলেছেন ধীরে ধীরে খুলে দেওয়া হবে। আসলে তালিবান নেতৃত্বের মধ্যে দুটি পন্থি আছে একদল নারীদেরকে ঘরের মধ্যে রাখতে চায় যাদের কাজ শুধু সন্তান লালন-পালন আর ঘর দেখাশোনা করা। এনারা বয়স্ক। আর খালিদ ভাইয়ার মতো তরুণরা চান নারীরা আলাদাভাবে সব ধরনের শিক্ষা নেবে। আমি পেশোয়ারে যে কলেজে নার্সিং-এর জন্য পড়ছি, সেটা একজন মহিলা সাহাবির নামে। যিনি ইসলামের প্রথম নার্স হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর নাম রুফাইদা আল আসলামিয়া। তিনি নবি সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে কয়েকজন নারী অনুসারী নিয়ে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা করার জন্য খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তারা খায়বর যুদ্ধে লব্ধ গণিমতের একটা অংশ পেয়েছিলেন। এছাড়াও মাসজিদে নববীর পাশে তিনি একটা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে অসুস্থদের চিকিৎসা দিতেন। খন্দকের যুদ্ধে সাদ ইবনে মুয়াজ রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহু আহত হলে তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই তাঁবুতে রেখে চিকিৎসার আদেশ দেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনেক আনসার মুহাজীর নারী সাহাবিদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দিতেন। অথচ আজ আমি সুযোগ পেলে কত আহত যোদ্ধাদের সেবা করে জেহাদের সোয়াব লাভ করতে পারতাম। আমি এসব আব্বুকে বলেছি। আব্বু বলেছেন যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। আপনি সুস্থ হলে কি দেশে ফিরে যাবেন?'

ওমার পাল্টা প্রশ্ন করে—

'বিক্রি করা জিনিস কি ফেরত নেওয়া যায়?'

আসমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—

'এ কথা কেন?'

'আমি যে জীবন আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি সেটা নিয়ে কীভাবে বাড়ি ফিরে যাব। চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত আমি আছি। গাজী অথবা শহিদ।'

দৃষ্টির দেওয়ালটা ভেঙে ওরা এখন পরস্পরের মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আরষ্টতা আর নেই। দুজনই সহজ হয়ে গেছে। অনুভূতিটা এখন আর দৃষ্টিতে নেই। সেটা এখন পৌঁছে গেছে বোঝাবোঝির জায়গায়। কথায় কথায় ওরা পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছে।

নার্সের মতো পেশাদারিত্ব আর মায়ের মমতা দিয়ে আসমা ওমারকে সারিয়ে তুলছে। সারাগায়ে স্প্লিন্টারের ক্ষত ধীরে ধীরে সাদা চামড়ার রূপ নিচ্ছে। কয়েকদিন পরপর ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে আবার নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। সে সময়টুকু ওমার চোখ বন্ধ করে বিছানায় সটান শুয়ে থাকে। কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে এখন একটু একটু হাঁটতে পারছে। এ ঘরের বারান্দাটা তার খুব প্রিয়, বারান্দার সামনে আদিগন্ত খোলা প্রান্তর, দূরে হিন্দুকুশ। যতক্ষণ একা থাকে ততক্ষণ সে এখানে বসে বসে আসমার জন্য অপেক্ষা করে। এদের পুরো পরিবার ওমারের আপন হয়ে গেছে। আসমার ছোট দুই ভাই হাসান এবং হুসেইন মাঝে মাঝে এসে উঁকি মেরে যায়। সাহস করে কাছে আসে না। আসমার দুই মা নিজের সন্তানের মতোই ওমারের প্রতি লক্ষ রাখে। তার জন্য বিশেষ বিশেষ রান্না করে। তার কাপড়চোপড় ধুয়ে দেয়। ওমারের মুখের ভিতরে এবং গালের ক্ষত অনেকটা ভালোর দিকে। এখন সে চিবিয়ে খেতে পারে কিন্তু অনেক সময় নিয়ে খায়। খালিদের বাবা আব্দুল্লাহ একবার গভীর রাতে কয়েক মিনিটের জন্য তার রুমে এসে তার সঙ্গে দেখা করে গেছে। তালিবানদের ইনটেলিজেন্স উইংয়ে কাজ করেন বলে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সতর্ক থাকতে হয়। তিনি প্রকাশ্যে চলাচল করেন না। তার নিরাপত্তার সাথে মোল্লা ওমরের নিরাপত্তা জড়িত। প্রায় সত্তর বছরের কাছাকাছি বয়স তার। এখনও শরীরের গঠন মজবুত। ওমারকে দেখে পিতার মতো বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন অনেকক্ষণ। তারপর বলেন—

'তোমার সাথে দেখা না হলেও আমি তোমার প্রতিদিনের খবর রাখি। আমার পরিবার তোমার মতো মেহমান পেয়ে গর্বিত। অবশ্য আমি তোমাকে আর মেহমান মনে করি না। তুমি আমার আর একটি ছেলে। জেহাদের ময়দানে তোমার সাহস আর বীরত্বে আমরা গর্বিত। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমার প্রচেষ্টা কবুল করবেন। আমাদের অবস্থান প্রতি মুহূর্তে গোপন আর বদল করতে হয়। আমাদের অবস্থান শনাক্ত করতে পারলে সেখানে গুপ্ত ঘাতক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর কাছে তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করি। দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত, ইনশাআল্লাহ জান্নাতে আমরা সবাই একদিন একত্রিত হব।'

ওমারের গালে চুমা দিয়ে লোকটা বের হয়ে গেলেন। ওমারের বুকের তরটা চিনচিন করে উঠল, তার মনে হলো কবরের জীবন থেকে তার বাবা ফিরে সে তাকে আদর করে আবার চলে গেলেন। লোকটাকে তার একবার বাবা বলে কতে ইচ্ছে করেছিল।

জানুয়ারি, ১৯৯৯

বরফে ঢেকে আছে পুরো কাবুল। যুদ্ধের তীব্রতা এখন কম। মূলত শীতকালে সবাই ব্যস্ত থাকে শক্তি সঞ্চয়ের। বসন্তকাল থেকে শুরু হয় পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ। হাজার বছর ধরে এটাই মধ্য এশিয়ার যুদ্ধের রীতি। উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বালখ এখন তালেবানদের দখলে। এর রাজধানী মাজার-ই-শরিফ দখলের জন্য ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে। দখল হয়েছে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ কুন্দুজ। পুরা আফগানিস্তানের ৭০ ভাগ এখন তালিবানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। নর্দান অ্যালাইন্স বা উত্তরের জোট এখন তালেকান, পাঞ্জশীর উপত্যকা আর বাদাখশান প্রদেশগুলোকে কেন্দ্র করে ৩০ ভাগ অঞ্চলের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে আছে। মাজার-ই-শরিফ তথা বালখ হচ্ছে প্রাচীন খোরাসানের একটি কেন্দ্রীয় নগরী। পুরা পারস্য, মধ্য এশিয়া আর আফগানিস্তান মিলে এই অঞ্চলকে বলা হতো খোরাসান। অতীতের মুসলিম শাসনামলে এই খোরাসানের প্রসিদ্ধ নগরীগুলো ছিল— মাশ্‌হাদ, নিশাপুর, মার্ভ, নিশা, ইস্পাহান, বালখ, হেরাত, বুখারা এবং সামারখন্দ।

ওমার বলল—

'বালখ হলো আমার এক প্রিয় কবির জন্মস্থান।'

ওমারের পায়ের ব্যান্ডেজ বদলাতে বদলাতে আসমা বলল—

'আমি জানি আপনি কার কথা বলছেন।'

ওমার ভ্রু কুচকে বলল—

'আসলেই জানেন?'

ওমার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আসমার দিকে। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজ প্যাচাচ্ছে ওমারের পায়ে, আর মুখ টিপে হাসছে। আসমার এই হাসি দেখলে ওমারের মনে হয়, শান্ত কাচের মতো স্থির একটা দিঘির জলে ছোট্ট এক টুকরো পাথর ছুড়লে যেভাবে ছোট ছোট গোলাকার ঢেউ বড় হতে হতে পৌঁছে যায় পাড়ে, তেমন করে, আসমার মুখ টেপা হাসি ধীরে ধীরে ঠোঁট থেকে ছড়িয়ে পড়ে ওর সারা মুখে, তারপর মুখ থেকে সারা গায়ে, তারপর সেখান থেকে সারা ঘরে...

ওমারের তন্ময় ভেঙে দিয়ে আসমা বলে—

'তিনি হলেন জালাল উদ্দিন রুমি।'

ওমার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—

'আশ্চর্য এটা আপনি কীভাবে বুঝলেন?'

'আমি খেয়াল করেছি আপনার সাথে আমার ভাবনার আশ্চর্য রকমের মিল আছে।'

কথাটা বলে আনমনা হয়ে যায় আসমা, তারপর হঠাৎ করেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—

'আপনি রুমির কোনো কবিতা জানেন? দেখি আপনার একটা পরীক্ষা নেই।'

ওমার হেসে বলে—

'তাহলে তো আমি ফেল, কারণ আমি বলব রুমি থেকে কিন্তু সেটা দাঁড়াবে অন্য কিছুতে।'

'তার মানে?'

'তার মানে হলো রুমি লিখেছে ফারসিতে, সেটা অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে, আমি পড়েছি আর বুঝেছি বাংলাতে, আর এখন সেই জিনিসটাকে বাংলা থেকে উর্দুতে অনুবাদ করে আপনাকে শোনাতে হবে।'

'ইস, খুব ভালো হতো আপনি যদি ফারসি ভাষা জানতেন। ফারসি জানলে দারি আর পশতুও আপনি শিখে যেতেন। মোটামুটি তিনটি ভাষাই কাছাকাছি। যেমন হিন্দি আর উর্দু কাছাকাছি, যেমন আমেরিকান ইংলিশ আর ব্রিটিশ ইংলিশ কাছাকাছি।'

'হ্যাঁ আমি পশতু শিখতে চাই। আপনার মাতৃভাষায় আপনাকে বুঝতে চাই।'

দুষ্টমি চেহারা নিয়ে আসমা জিজ্ঞেস করে—

'আমাকে বোঝার জন্য নাকি রুমিকে বোঝার জন্য?'

এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আসমা। উত্তর জানার জন্য ওমারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে শব্দ খুঁজছে উত্তর দেওয়ার জন্য, সেটা বুঝে ওমারকে যেন উদ্ধার করার জন্য আসমা বলল—

'আচ্ছা রুমির কবিতা শুনি তারপর উত্তর দিলে হবে।'

ওমার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার প্রিয় রুমির কবিতাটা প্রথমে বাংলায় শোনাল, তারপর উর্দুতে যথটা সম্ভব অনুবাদ করল—

'দশদিকে কোথাও খুঁজে পেলাম নাকো
শুনেছিলাম মক্কায় তুমি থাকো!
কড়া নেড়েছিলাম কাবাঘরে
খুঁজে খুঁজে হয়রান আমি পৃথিবীর প্রান্তরে।
অথচ আশ্চর্য!
তুমি বসে আছ এই বুকে!
দিচ্ছ জানান ধুকপুকে ধুকপুকে।'

বুঝতে একটু সময় নিলেও কবিতার ভাব বুঝে আসমা ধরে ফেলল রুমির মূল কবিতাটি। তারপর মূল ফারসিতে গড়গড় করে বলে গেল। আসমার মুখে ফারসি যেন সত্যি সত্যি একটা জীবন্ত ভাষা হয়ে উঠল। তাই ওমার বলল—

'নাহ, পশতু না আমাকে ফারসিই শিখতে হবে।'

ঘরের কোণে পাথরের ফায়ার প্লেসে কাঠ ভরে দিতে দিতে আবার আগের প্রশ্নে ফিরে আসল আসমা। আবারও সেই মুখ টেপা হাসি।

'কার জন্য?'

ওমার সরাসরি আসমার চোখে চোখ রেখে বলল—

'ভালোবাসার জন্য।'

আগুনে নতুন কাঠ পটপট শব্দে পুড়ছে। সেদিক থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে গোল গোল চোখে ওমারের দিকে তাকাল আসমা।

ওমার বলল—

'আপনার মুখে মূল ভাষায় রুমি শুনে মনে হলো ভালোবাসার যদি নিজস্ব কোনো ভাষা থাকত তবে সে ভাষা নিশ্চই ফারসি হতো।'

'আপনি যেন বুঝতে ভুল করবেন না। রুমি কিন্তু মানবিক প্রেমের কথা বলেনি। তিনি স্রষ্টাকে ভালোবেসে তার সৃষ্ট জগতকে ভালোবেসেছেন, যারা রুমিকে ভুল বোঝে তারা স্রষ্টাকে ফেলে তার মাখলুকের প্রেমে বিভোর হয়।

রুমি বলেন—

"স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর হাজারো পথ আছে,
তার মাঝে আমি প্রেমকে বেছে নিলাম।"

এবার ওমার বলল, রুমি বলেন—

"আমি প্রেমে পড়ার পূর্বেই প্রেমের গল্প বলেছি,
কিন্তু আমি যখন প্রেমে পড়লাম
তখন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।"

এবার আসমা বলল, রুমি বলেন—

"আল্লাহর প্রেমে তোমার আত্মাকে উৎসর্গ কর।
কসম করে বলছি এছাড়া আর কোনো পথ নেই।"

এবার ওমার বলল, রুমি বলেন—

"ভালোবাসা হলো সেই সংযোগ রেখা,
যেটা আছে তোমার আর পৃথিবীর মাঝে।"

এরপর আসমা বলল, রুমি বলেন—

"মুখের কথাই সকল কষ্টের কারণ,
তাই কারো কথায় বেশি গুরুত্ব দিও না।
ভালোবাসার সাম্রাজ্যে কথার কোনো স্থান নেই
ভালোবাসা হলো নীরবতা।"

এবার ওমার বলল, রুমি বলেন—

"তুমি কেবল তোমার হৃদয় দিয়েই
অনন্তকে ছুঁতে পার।"

এরপর তারা দুজনই নিশ্চুপ বসে থাকে। সতরঞ্জির উপর বিছানো দস্তরখানে ওমারের জন্য খাবার সাজানো আছে। নীরবতার ভিতরে আগুনে পটপট করে শব্দ তুলে পুড়ছে কাঠ।

ওমার বলল—

'দেশে আমার একজন ইমাম আছেন, তার কাছ থেকে প্রথম জেনেছি, "হৃদয় আল্লাহর ঘর"। সে ঘরে অসীম আল্লাহকে না রেখে মানুষ সেখানে রাখে বস্তু। এখন আমি জানি পার্থিব প্রেম হলো বিচ্ছেদের, এখানে মিলন নেই, মিলনের জায়গা হলো জান্নাত। অনন্ত জীবন ছাড়া অনন্ত প্রেম পূর্ণ হয় না। এটা সেই প্রেম যা আমাকে টেনে এনেছে আফগানিস্তানে।'

রাতে আর ভালো ঘুম হয় না আসমার। আসমা বুঝে গেছে এই যুবক অন্য সবার মতো না। অন্যরা যেখানে আগুন, ওমার সেখানে আলো। পার্থিব পোশাক পরে অপার্থিব জগতে বসবাস করে। অন্যরা রুমি পড়ে, কিন্তু সে রুমিকে ধারণ করে। মনে মনে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানায়, আল্লাহ এমন এক মেহমানকে তাদের ঘরে পাঠিয়েছেন, যে নার্সিং আর খেদমত সে করে, সেটা সে যেকোনো মানুষের জন্যই করত, কিন্তু ওমারের জন্য সে যা করে তবুও তার মনে হয় কিছুই করা হয় না। প্রথম প্রথম দিনে রুটিন মেনে তিনবার যেত। এখন কারণে অকারণে যায়। তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে, তার কথা শুনতে ইচ্ছে করে। যতদিন যাচ্ছে ধীরে ধীরে একটা ভয় তার ভেতরে দানা বাঁধছে। একদিন ওমার সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, সেদিন সে এখান থেকে চলে যাবে। কোথায় যাবে, নিশ্চই ফ্রন্ট লাইনে যাবে, ততদিনে যুদ্ধ থেমে গেলে হয়তো বাড়ি ফিরে যাবে। এমন মানুষকে কার সাধ্য আছে আটকে রাখার। কী যে এক কঠিন মায়া লোকটার ভেতরে। নামাজে সেজদায় দোয়ায় আল্লাহকে বলে,

'আল্লাহ আমার অন্তরকে শান্ত করে দাও। যেকোনো রকম সীমালঙ্ঘন থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'

কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়ারের কত সুদর্শন যুবকেরা আসমাকে প্রেম নিবেদন করেছে, বিয়ে করতে চেয়েছে, কিন্তু কোনোদিন কারো জন্য তার ভিতরে কোনো অনুভূতি হয়নি। কিন্তু এর জন্য কেন এমন হচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে হারানোর ভয়টা ধীরে ধীরে বাড়ছে। অথচ আসমা তাকদিরে বিশ্বাসী মানুষ। সে জানে আল্লাহ তার জন্য সেটাই করবেন যেটাতে তার মঙ্গল। ছোটবেলা থেকে তারা জেহাদের

শিক্ষা নিয়ে বড় হয়েছে, তার পরিবারের সবাই জেহাদের ভিতরেই আছে। নার্সিং সার্টিফিকেট পেলে সেও জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে, চিকিৎসা আর সেবা দেবে অসুস্থ আর আহত মুজাহেদ্দীনদেরকে। দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে এত পরওয়া করে লাভ নেই, আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। ওমারের কথাই ঠিক। পৃথিবী বিচ্ছেদের জায়গা, মিলনের জায়গা জান্নাত। সেখানে এই পৃথিবীর মতো কোনো হারানোর ভয় নেই।

তাকদির কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওমারকে। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে অজানা দেশে নিশ্চিত নিরাপদ এক পারিবারিক জীবন। গরম খাবার, গরম ঘর আর ভালোবাসার জন্য একদল উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় ওমার। ঘাত-প্রতিঘাত দিনকে দিন তার ভাবনাকে আরও গভীর করছে। মানুষ স্রষ্টার জন্য প্রাণ দিতে চায়, এই প্রাণটাও তো স্রষ্টারই দেওয়া। তাহলে মানুষ আসলে কী দেয়। মানুষের আসলে নিজের কিছুই নেই যা সে স্রষ্টাকে দিতে পারে। মানুষ যা করতে পারে সেটা হলো, তার অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে, আর সেটা প্রকাশ করতে পারার জন্যও সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। এই জন্য সবচেয়ে বড় পাপ হলো অকৃতজ্ঞতা।

মগ ভর্তি গরম সবুজ চা আর জানালার ওপাশে তুষার শুভ্র পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তার উপলব্ধি হয় আকাঙ্ক্ষা থেকে বেঁচে থাকার নামই স্বাধীনতা। আসমা ধীরে ধীরে তার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হচ্ছিল। যেটা তার ভেতরে একটা চাপ তৈরি করছিল। লামিয়াকে সে নিশ্চিত ভেবেছিল, কত সহজ ছিল লামিয়াকে পাওয়া, সেই লামিয়াকে যখন কেড়ে নেওয়া হলো, সেই বিচ্ছেদ বেদনা থেকে বাঁচার জন্য সে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল। না, সে আর কাউকে চাইবে না। পৃথিবীতে সে তার নিজের ইচ্ছায় আসেনি, নিজের ইচ্ছেতেও তার যাওয়া হবে না, তাহলে মধ্যবর্তী এই সময়টুকুতে নিজের ইচ্ছে তৈরি করবে কেন? আমার কী প্রয়োজন সেটা আমার চেয়েও যিনি বেশি জানেন তার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করার দরকার নেই। তাই আসমার বিষয়টা তার হাতে তুলে দিয়ে ওমার এখন চাপমুক্ত হয়ে গেল। জানালার কাচের ভিতর দিয়ে শুভ্র পবিত্র পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তাকে বলল—'আমি রাজ্য চাই না হে মহাপরাক্রমশালী সম্রাট, আমি তোমাকে চাই।'

বসন্ত শুরুর সাথে সাথে পাঞ্জশির উপত্যকার সবুজ ঘাসে ফোটা শুরু হয়েছে ছোপ ছোপ রক্তের ফুল। পাঞ্জশির প্রবল যুদ্ধে কাঁপছে হিন্দুকুশের পাদদেশ। পাঞ্জশির মানে পাঁচ সিংহের উপত্যকা, এখানকার ৬ষ্ঠ সিংহের নাম আহমেদ শাহ মাসুদ। যাকে বলা হয় দ্য লায়ন অভ পাঞ্জশির। সোভিয়েত বাহিনী তাদের সর্বশক্তি দিয়েও পাঞ্জশির উপত্যকায় কখনো ঢুকতে পারেনি, সেই মহান দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এখন আটকে পড়া আহত সিংহের মতো পাঞ্জশির রক্ষায় লড়ছে তাদের বিরুদ্ধে, যাদের সাথে একসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দখলদার সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়েছিল। উত্তরের আরেক সেনাপতি আব্দুর রশিদ দোস্তাম আর মাসুদের যৌথ কমান্ডে, তাখার, তালেকান, পাঞ্জশির উপত্যকা আর বাদাখশান, এই কয়টি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে শেষ প্রতিরোধ। আর মাত্র এই অংশটুকু দখল করতে পারলে, তালেবানদেরও কাজটা শেষ হয়ে যায়। তখন পুরো আফগানিস্তান জুড়ে তাদের ইসলামি হুকমাত কায়েম হয়ে যাবে। দুই পক্ষই লড়ছে মরিয়া হয়ে।

ওমার এখন দুই হাতের কাঠের ক্রাচ ছাড়াই হাঁটতে পারে। তবু হাঁটার সুবিধার জন্য এক হাতের লাঠি হিসেবে একটা এলবো ক্রাচ ব্যবহার করে। পায়ের হাড় কিছুটা কেটে ফেলার জন্য তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। গায়ে অসংখ্য দাগ রেখে ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে। আসমা হাসতে হাসতে বলে—

'খালি গায়ে আপনার শরীর দেখতে যুদ্ধে বিধ্বস্ত কাবুল শহরের মতো লাগে।'

'একদিন সব দাগ ক্ষত মুছে যাবে, এই শহরটাও নতুন হয়ে উঠবে। আর কত, গত ২০ বছর ধরে একনাগারে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে একটা দেশ। এই দেশটার জন্য আমার এখন মায়া হয়।'

'আর কারো জন্য মায়া হয় না?'

নীল বোরখার ভেতর থেকে প্রশ্ন নিয়ে ঝকঝক করছে একজোড়া সবুজ চোখ। সে চোখে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না ওমারের। কিন্তু সীমালঙ্ঘন হয়ে যাওয়ার ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয়। কোনো রাখঢাক না করে প্রশ্নের উত্তরে বলে—

'হ্যাঁ, হয়, আপনার জন্য হয়। অনেক চেষ্টা করেছি আপনার মায়া কাটাতে পারিনি। সমস্যা হচ্ছে আপনি আমার জন্য যা করেছেন, সেটা কোনো মা তার সন্তানের জন্য করে। এর বিনিময়ে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, গত দেড় বছরে

আপনি আমার জন্য যা করেছেন সে জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি বারবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছি, আমি অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রবেশ করতে দিতে চাই না। কিন্তু আপনি আমার কোনো প্রতিরোধই মানছেন না। বারবার আপনি আমার হৃদয় দখল করে নিচ্ছেন। তাই আপনার সিদ্ধান্ত আমি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি তাই করবেন যা আমার জন্য ভালো হয়। আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষাই আছি।'

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে ওমার আসমার দিকে তাকাল। সবুজ চোখজোড়া অপলক তাকিয়ে আছে ওমারের দিকে। দুচোখ টলটল করছে অশ্রুতে, একটু টোকা দিলেই যেন মুক্তা দানাগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়বে। ওমার ভাবছে এই অশ্রু খুশির নাকি বিষাদের।

আসমা বলল—

'আমিও আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।'

পাঘমানের বিধ্বস্ত আর্চ ডি ট্রামপ্ পার্কের সবুজ ঘাসে ওমার আর আসমা পাশাপাশি বসে আছে। বসন্তের মিষ্টি গন্ধ বাতাস ঢেউ খেলছে আসমার নীল বোরখায়, ওমারের অবিন্যস্ত লম্বা চুলে। ওমার বুক ভরে টেনে নিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার বিশুদ্ধ বাতাস। লামিয়া তার জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর যে বিষাদ ওমারকে গ্রাস করে নিয়েছিল, সেটা আজ এই মুহূর্ত থেকে শেষ হয়ে গেল। এক অজানা খুশিতে ভরে উঠেছে ওমারের অন্তর। বোরখার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখা এই অনিন্দ্য সুন্দরী নারীর হৃদয়ে আল্লাহ তার জন্য মমতা আর প্রেম ঢেলে দিয়েছেন, এই জানাটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারার পর ওমারকে নিয়ে হাঁটতে বের হয় আসমা, কখনো তাদের সঙ্গে থাকে তাদের ছোট ভাইবোন গুলো। কখনো গ্রামের বাজারে যায়, ইচ্ছে মতোন বাজার করে। ওমারের দেশ থেকে নিয়ে আসা ডলারগুলো খরচ করার সুযোগ পায়নি আগে, এখন মাঝে মাঝে সে আসমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায়। ওরা পাশাপাশি হাঁটে, ওমার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, আসমা সতর্ক থাকে সে সময়, যেন পাথরের সঙ্গে ওমার হোচট খেয়ে পড়ে না যায়। ওমার সেটা লক্ষ করে হাসি মুখে বলে—

'আপনার এমন সতর্ক দৃষ্টি আমার অভ্যাস খারাপ করে দেবে, নইলে বাকি জীবন আমি একা একা হাঁটতে পারব না।'

আসমাও মজার ছলে বলে—

'আপনি হাঁটতে না পারলে আল্লাহ আপনার পিঠে ডানা তৈরি করে দেবেন, আপনার তো মাটিতে হাঁটার কথা নয়, আপনার ওড়ার কথা। কারণ আপনি আসলে পাখি, একদিন আপনি আমাদের ছেড়ে ঠিকই উড়ে চলে যাবেন।'

কথাটা বলেই আসমা গম্ভির হয়ে যায়। এ কথায় ওমারের ভেতরে দারুণ ঝড় ওঠে। আবার হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠা গলায় আসমা বলে—

'উড়ে উড়ে আপনি আর কতদূরে যাবেন, আপনি ওমার যদি পাখি হতে পারেন তবে আমি আসমা, আসমান হয়ে যাব। কোথায় যাবে, কতদূরে যাবে পাখি আসমান ছেড়ে! আমি সে পাখির জন্য আসমান হয়ে থাকব।

এমন থইথই পূর্ণিমার প্লাবন ওমার তার জীবনে আর দেখেনি। রুশোর সাথে বুড়িগঙ্গায় দেখেছিল অন্ধকারের তারাভরা রাত, কিন্তু এমন স্বাসরুদ্ধকর পূর্নিমা এই প্রথম। পাঘমানের পাহাড়ি ঢালের পূর্বমুখ থেকে যেন খুলে গেছে জান্নাতের দরজা। হিন্দুকুশের মাথার উপরের শুভ্র বরফের আয়নায় উপুড় হয়ে নিজের চেহারা দেখছে রূপবতী চাঁদ। নৈঃশব্দ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে অচেনা রাতচরা পাখি আর দূরে কোথাও কেঁদে ওঠা পাহাড়ী নেকড়ে। উপত্যকার ফির গাছের উপর যে বাতাস আছড়ে পড়ছে, সে বাতাস প্রাগৈতিহাসিক। এ বাতাস ধারণ করে আছে কত শত গ্রিক, পারসি, আরব, মঙ্গল, তুর্ক আর তাতার যোদ্ধার তেজী ঘোড়ার গরম নিঃশ্বাস আর নিপিড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। এই মধ্য এশিয়ান জোছনায় সিল্করোড ধরে নিঃশব্দ ছায়া ফেলে চলে যায় যে ক্যারাভ্যান তার নাম ইতিহাস। এই চাঁদ এই জোছনা এই মায়াময় পৃথিবী যেন মৃত্যুর মতো শীতল এক গোপন সৌন্দর্য, যা পরিব্রাজকের দৃষ্টিকে বিভ্রম করে দেয়। এটা এমনই এক ঘুম কেড়ে নেওয়া রাত। ওমার জানত সে আসবে, ওমার জানে সে এসেছে। পেছনে মৃদু শব্দে খুলে যায় দরজা। ভাবলেশহীন ওমার স্থির তাকিয়ে থাকে সামনে অপার রহস্যের দিকে। ওমারের পাশের চেয়ারে এসে বসে আসমা। ওমার শুধু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আবার সামনে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চুপ দুজন মানুষ এক দৃষ্টিতে দেখছে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ জোছনা।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙে আসমা।

'সুস্থ হয়ে গেলে আপনি কি আবার যুদ্ধে ফিরে যাবেন?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ওমার উত্তর দিল—

'না।'

আসমা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওমারের দিকে, নির্লিপ্ত কিন্তু কণ্ঠে দৃঢ়তা নিয়ে ওমার বলল—

'আমার হাত আমার কোনো মুসলিম ভাইকে হত্যা করবে না।'

দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে ফজরের আজান। আসমা নীরবে উঠে গেল ওমারের পাশ থেকে। পেছনে তার ছোট ছোট চঞ্চল পায়ের শব্দ ঘরটাতে রেখে গেল তার খুশির চিহ্ন।

সেপ্টেম্বর, ২০০১

হঠাৎ করে সারা কাবুল জুড়ে আতশবাজির মতো ফুটছে গুলি। এটা ঠিক যুদ্ধের মতো না। আনন্দ প্রকাশ করে যেভাবে শূন্যে গুলি ছোড়া হয়। বিভিন্ন বাড়ির ছাদে, রাস্তায় বাজারে যে যার মতো আকাশে গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। দূরে কোথাও হেভি আর্টিলারি থেকে ছুড়ছে কামানের গোলা। ওমার তখন ক্লাস নিচ্ছিল। কয়েক মাস হলো ওমার এখানকার একটা স্কুলে জয়েন করেছে। ছেলেদের এই স্কুলটা সরকারি হলেও এটা এখন তালিবানদের নির্দেশনায় চলে। ওমার ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত ইংরেজি পড়ায়। খালিদ ওমারের শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজে থেকেই এই চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আহত হওয়ার কারণে ভ্রাতৃঘাতী এই যুদ্ধে তাকে আর ফিরে যেতে হচ্ছে না বলে আল্লাহর কাছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। খালিদ বলেছে, 'দারুল ইসলামের জন্য করা যেকোনো কাজই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আমরা ইসলামের সীমানা বাড়াতে থাকি, আর এদিকে তুমি আগামী দিনের মুজাহেদ্বীন তৈরি করতে থাকো। ইসলামের বাণী পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হলে আমাদের বিভিন্ন ভাষার ওপর দখল থাকতে হবে, বিশেষ করে ইংরেজি।'

ক্লাস ফেলে রেখে দ্রুত স্কুলের টিচার রুমে গিয়ে দেখে অন্যান্য শিক্ষকরা মনোযোগ দিয়ে রেডিও শুনছে। ওমার জানল, পাঞ্চশির উপত্যকার সিংহ, উত্তরের তালিবান বিরোধী জোটের প্রধান সেনাপতি আহমেদ শাহ মাসুদকে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। তাখার প্রদেশের খাজা বাহাউদ্দিন এলাকায় নিজ কমান্ড পোস্টে টেলিভিশন সাংবাদিক পরিচয়ধারী দুই ঘাতকের ক্যামেরার মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে মাসুদকে হত্যা করা হয়। টিচারদের মধ্যে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া। একদল এবার যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে মনে করে খুশি, অন্য দলের কাছে মাসুদ তালিবান বিরোধী হলেও সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে তার আত্মত্যাগের জন্য তাকে সবাই সম্মান করে। সাধারণ পশতুনরা উৎফুল্ল হয়ে আনন্দ করছে, সবার ধারণা এবার যুদ্ধ শেষ হবে। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে। ওমার রেডিওর খবর শুনতে শুনতে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারে তারিখটার দিকে লক্ষ করল, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ সাল। খোদ তালিবানদের মুখেই মাসুদের অনেক বীরত্বের গল্প শুনেছিল ওমার। মনে মনে পড়ল ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইয়ে রাজেউন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এসেছে ওমার। যে মুজাহেদ্বীনরা জীবনবাজি রেখে সোভিয়েট পরাশক্তির বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, পরে

তারাই ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা আর গোত্রীয় প্রাধান্য নিয়ে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দিনের পর দিন হত্যা আর অরাজকতার ফিতনায় লিপ্ত ছিল। আল কোরআনের সূরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা আছে, "ফিতনা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।" আর বাকারার ১৯৩ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়"। ইসলামের প্রথম ফিতনা বা গৃহযুদ্ধের শুরু হয় তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহু কে হত্যার পর থেকে। সে ফিতনা পরবর্তীতে জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের মতো করুণ পরিনতি বয়ে আনে। ফিতনার ধারাবাহিকতায় ঘটে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা। তালিবানরা বলে তারা ফিতনা বা গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যুদ্ধ করছে, তারা প্রমাণ করেছে তারা সেটা পেরেছে। এখন ৯০ ভাগ অঞ্চলে যুদ্ধ নেই, সমস্যা থাকলেও অভূতপূর্ব সামাজিক নিরাপত্তা আছে। কিন্তু সেই জন্য এক মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে হচ্ছে অন্য ভাইকে। এটাই কঠিন বাস্তবতা, ইসলাম গ্রহণের পরও হক বাতিলের লড়াই চলতে থাকবে। সবার ইমানের মাত্রা এক হয় না, তাই মুসলিমদের মধ্যেও জালিম তৈরি হয়, পাপাচারী তৈরি হয়, সন্ত্রাসী তৈরি হয়, তখন অন্য মুসলিমরা এগিয়ে এসে প্রতিরোধ করে। চেপে ধরে জুলুমবাজ সন্ত্রাসী আর ফিতনা সৃষ্টিকারীর হাত। তালিবানরা যখন গুলি ছোড়ে বলে আল্লাহু আকবর, তাদের প্রতিপক্ষরা যখন গুলি ছোড়ে তারাও বলে আল্লাহু আকবর। বাগরামের যুদ্ধে এই দৃশ্য ওমারের মনে দারুণ ভাবান্তর সৃষ্টি করেছিল। অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে এই বিষয়ে সে অনেক ভেবেছে। ফেতনাকালীন সময়ে বা গৃহযুদ্ধের সময়ে মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে জেনেছে। মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে যখন হক বাতিল বা সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ শুরু হবে তখন মুসলিমদের তৃতীয় দলটি নিজেদেরকে সেই ফেতনা থেকে দূরে রাখবে।

এর ঠিক দুই দিন পরে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, সারা পৃথিবীকে স্তব্ধ করে ঘটল আর একটা ঘটনা। চারটা প্লেন হাইজ্যাক করে, দুইটা প্লেন দিয়ে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আঘাত করা হয়েছে, তৃতীয়টি আঘাত করেছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হেড কোয়ার্টার পেন্টাগনে, চতুর্থটি ওয়াশিংটন ডিসির দিকে যাওয়ার পথে পেনসিলভেনিয়াতে বিধ্বস্ত হয়। আমেরিকা বলছে ঘটনা ঘটিয়েছে আল কায়দা নামের মুসলিম সন্ত্রাসী সংগঠন। যার মাস্টার মাইন্ডের নাম ওসামা বিন লাদেন। বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল কায়েদার ঘাঁটি আফগানিস্তানে। তালেবানের ছত্রছায়ায় তারা আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে, তাই আমেরিকার দাবি ওসামা বিন লাদেনকে এবং অন্যান্য সব আল কায়েদা লিডারদেরকে বিনা শর্তে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ২০ সেপ্টেম্বর তারা তালিবানকে এই আলটিমেটাম দেয়। আমেরিকানদের আলটিমেটামের উত্তরে ২১ সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানে নিযুক্ত

তালিবানদের দূত মোল্লা আব্দুস সালাম জাইফ জানায়, 'তোমরা ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছ তার সপক্ষে প্রমাণ দাও, আমরা শরিয়া আইনে তার বিচার করব।' আমেরিকা তালেবানদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২২ সেপ্টেম্বরে আমেরিকানদের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে উত্তরের জোট তালিবানদের বিরুদ্ধে নতুন উদ্দমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলতে থাকে মরণপণ যুদ্ধ। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১, তালিবানদের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমার আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এই ঘোষণা জারির পরপরই খালিদ সেদিন ছুটে আসে ওমারের স্কুলে, তার সাথে দেখা করতে।

গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত খালিদ ওমারকে বলল—

'খুব জরুরি একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি। বুঝতেই পারছ, সারা পৃথিবী দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের বিরুদ্ধে। আমি বিশ্বাস করি আমরা সত্যের ওপরে আছি। সত্যকে পরীক্ষার ভিতর দিয়েই সত্যে পরিণত হতে হয়। ওরা আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চায়। জমিনের ওপর আল্লাহর ইচ্ছেই কার্যকর হবে।'

ওমার বলল—

'নিরীহ যাত্রিসহ প্লেন হাইজ্যাক করে টুইন টাওয়ারে যে হামলা করা হয়েছে, আমি সেটাকে সমর্থন করি না।'

খালিদ বলল-

'আমিও করি না, বিন লাদেন বলেছেন তিনি সেটা করেননি। ধরলাম বিন লাদেন মিথ্যে বলছেন, তা হলে তোমরা আমাদেরকে প্রমাণ দাও, প্রমাণ পেলে অবশ্যই আমরা তার বিচার করব। আমরা ইনসাফ না করলে তবে কে করবে। সে যদি দোষি হয় তবে একজন অপরাধীকে বাঁচাতে আমরা আমাদের দেশ ধ্বংস হতে দিতে পারি না। এই মুহূর্তে আমরা আফগানিস্তানের প্রায় ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছি। একজন অপরাধীর জন্য আমরা আমাদের এত কষ্টের অর্জন শেষ করে দিতে পারি না। কিন্তু যদি তা না হয়, শায়খ ওসামা যদি অপরাধী না হয় তবে সারা পৃথিবী উল্টে গেলেও আমরা আমাদের একজন নীরপরাধ ভাইকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না। এটা ইসলাম অনুমোদন করে না। আর নিশ্চই তুমি জানো আফগানরা মেহমানদের কোন উচ্চ মর্যাদায় রাখে। মানুষ তো মানুষ, তোমাকে একটা গল্প বলি, গজনির সুলতান মাহমুদ একবার শিকারে এক হরিণের পিছু ধাওয়া করছিলেন। সেই হরিণ ছুটতে ছুটতে এক পাঠানের আঙ্গিনায় ঢুকে পড়ে। তখন সেই পাঠান অস্ত্র উঁচিয়ে সুলতানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'ফিরে যান সুলতান, এই হরিণ এখন আমার মেহমান। তাকে ধরতে হলে আমাকে মেরে তারপর তাকে ধরতে পারবেন।'

সুলতান পাঠানের মেহমানদারি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। আমরা আফগানরা তো সেই জাতি।

যা-ই হোক, আমাদের সামনের দিনগুলো বড় কঠিন হবে। আমরা এসবকে পরোয়া করি না। আমরা দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত কিনেছি। আমাদের দুশমনরা বাঁচার লোভ করে, আমরা শাহাদতের লোভ করি। হয়তো খুব বেশি সময় নেই, আমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হব। আমি আজ আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা তোমার সাথে আসমার বিয়ে দিতে চাই। জানি, এমন প্রস্তাবের সময় এটা নয়, আমরা আসমার একজন অভিভাবক চাই। সামনের দিনগুলোতে যে তাকে আশ্রয় দিয়ে রাখবে। আমি আসমার সাথে কথা বলেছি, সে তোমাকে পছন্দ করে। আমার বাবা এবং আমাদের পরিবার সবাই তোমাকে পছন্দ করে। এখন তুমি রাজি থাকলে আমরা বিয়েটা সেরে ফেলতে পারি।'

এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে ওমার হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তার ভালোবাসার বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত এসে গেছে। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। সে এমন একটি দিনের জন্য অপেক্ষায় ছিল, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ভিজে ওঠে। ওমারের এমন নীরবতা দেখে খালিদ অসহায় বোধ করে। সে ওমারের হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ওমার তুমি রাজি আছ?'

ওমার খালিদের সেই হাতের ওপর নিজের হাত রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছে কার্যকরী হোক।'

খালিদ খুশিতে ওমারকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখল ওমারকে। যখন ছাড়ল তখন পরিবর্তন হয়ে গেছে খালিদের চেহারা।

আশঙ্কা নিয়ে বলল—

'নিশ্চই তুমি আমেরিকান এয়ার পাওয়ার সম্পর্কে জানো, আমরা সেটার সামনে টিকতে পারব না। আমরা অপেক্ষা করব ওদের গ্রাউন্ড ফোর্সের জন্য, কিন্তু সম্ভবত সেটা ওরা সহজে করবে না। ওরা সেই কাজ উত্তরের জোটকে দিয়ে করাবে, আর ওদেরকে ফুল এয়ার সাপোর্ট দেবে। তার মানে আমেরিকা আর ন্যাটো তার বিমানবাহিনীকে আমাদের বিরুদ্ধে নিশ্চিন্তে প্রতিরোধহীনভাবে ব্যবহার করবে, কারণ ওরা জানে আমাদের এয়ার ডিফেন্স নেই। আমাদের যে এন্টি এয়ারক্রাফটগানগুলো আছে সেগুলো ওদের এফ-১৪ টমক্যাট, এফ-১৫ ঈগল, এফ-১৬ ফাইটিং ফ্যালকন, বি-৫২ বোম্বার আর ব্যালেস্টিক টোমাহক মিসাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। ওমার, মনোবল হারিয়ো না, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ওরা কাবুল, কান্দাহার, কুন্দুজ, জালালাবাদ, মাজার-ই-শরিফ, হেলমান্দ, হেরাত সব বোমা মেরে তছনছ করে দেবে। আর প্রথম টার্গেট হবে কাবুল। হাতে

একদম সময় নেই। তোমাদের বিয়েটা আজ রাতেই সেরে ফেলব। এখন আমার সাথে বাসায় চলো।'

খালিদ একটা পুরাতন রয়্যাল এনফিল্ড বাইক নিয়ে এসেছিল ওমারের সাথে দেখা করতে। সেটা স্টার্ট দিতে দিতে ওমারকে বলল,

'আমি এই বাইকটা তোমাকে দিয়ে যাব। তুমি নিশ্চই বাইক চালাতে জানো?'

ওমার বলল,

'জানি।'

'আমি যেখানে যাব সেখানে বাইকটা কাজে লাগবে না। মনে কর তোমার বিয়েতে এটা আমার উপহার।'

ওমারের স্কুল থেকে পাঘমানের মুছা কালা গ্রাম দশ মাইল দূরে। ওমারকে পেছনে নিয়ে খালিদ যেন বাইকটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে ওমারের মনটাও খুশিতে পাখির মতো উড়ছে। দুই হাত দুই পাশে ডানার মতো মেলে দিল। মাথার ওপর ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশ। সেদিকে তাকিয়ে ওমার মনে মনে বলল, 'প্রিয় আসমান, এই দেখ, তোমার জন্য আমি পাখি হয়ে গেলাম।'

বিমান আক্রমণের ভয়ে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে ঢেকে আছে রাজধানী কাবুল। এর মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বরের রাতে খুব সাদামাটাভাবে ওমারের সাথে বিয়ে হয়ে গেল আসমার। গ্রামের মসজিদের মোল্লা বিয়ে পড়িয়েছে। দুই-এক ঘর প্রতিবেশী এসেছে বিয়েতে শরিক হতে। গাঁয়ের একজন বৃদ্ধা মহিলা তাদের জন্য দোয়া করে বলল, 'এই যুদ্ধের মধ্যে তোমাদের বিয়েটা যেন কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের মেয়ে সাকিনার সাথে ইমাম হাসানের ছেলে কাসেমের বিয়ের মতো।'

সবাই মিলে রাতের খাবার খেল। আসমার দুই মা মিলে সাধ্যমত রান্না করেছে, পোলাও, চোপান কাবাব, চাপলি কাবাব, কড়াই গোস্ত, তন্দুরি সেঁকা নান, আর খাওয়ার শেষের মিষ্টান্ন ছিল শিরব্রিঞ্জ, বাকলাভা এবং তাজা ফল। খালিদকে আজ অস্বাভাবিক রকমের হাসিখুশি দেখাচ্ছে। ছোট ভাইবোনগুলো খালিদের সাথে হুটোপুটিতে মেতেছে। খালিদ তাদের সাথে কার্পেটের ওপর গড়াগড়ি করে খেলছে। ওমার একদৃষ্টিতে সে দৃশ্য দেখছে। খালিদ এক অসাধারণ যুবক। নিজে এখনও বিয়ে করেনি। তার নাকি বিয়ে করার মতো সময় হাতে নেই। এদের পরিবার দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, এখানে কে কোন মায়ের সন্তান। এমন উৎফুল্ল খালিদকে দেখে ওমারের কেন যেন মনে হচ্ছে এই যুবকটিকে হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে, ওমারের বুক চিড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। রাত বাড়তে থাকে, গ্রামের প্রতিবেশীরা চলে যায়। উপত্যকার নিচের সড়ক থেকে শোনা যায় একটা পিকআপ ট্রাকের হর্ন। সেটা শুনে নিজের ছোট ভাইবোনদেরকে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে ছুটে যায় জানালার দিকে। জানালায় উঁকি দিয়ে এসে ওমারকে বলে,

'যেতে হবে'।

খালিদ বাড়ির ভেতরে তার মা'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসে, ভাইবোনদের আদর করে শেষে দাঁড়ায় আসমার সামনে। আসমা জানে সামনের দিনগুলোতে কী ঘটতে যাচ্ছে। তার বুক ভেঙে কান্না আসে। খুব সাদামাটা বিয়ের সাজে সেজেছে আসমা, হাতে মেহেদী লগিয়েছে। গায়ে একটা সবুজ মখমলের নতুন চাদর, ওর সবুজ চোখের সাথে অদ্ভুতভাবে ম্যাচিং করেছে। ভাইকে জড়িয়ে ধরে নীরব কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে আসমা। খালিদ খুব শক্ত মনের মানুষ। বোনের কপালে চুমু খেয়ে বলে 'ফি-আমানিল্লাহ।'

তারপর দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ওমার পেছন পেছন আসে তাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। পিকআপ নিয়ে চারজন স্বশস্ত্র তালিবান যোদ্ধা তার জন্য অপেক্ষা করছে। মাঝপথে ওমারকে থামিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ওমারকে আলিঙ্গন করে বলে—

'আজ থেকে এই পরিবারের দায়িত্ব তোমারও। আমি এখন কুন্দুজে চলে যাব, সরাসরি ফ্রন্ট লাইনে। এয়ার রেইড শুরু হলে বেইসমেন্টে চলে যেও। বেসমেন্টে আমাদের ব্যক্তিগত রাইফেল অ্যামুনেশন আছে, প্রয়োজনে সেসব ব্যবহার কর। যেহেতু আসমা সরকারি হাসপাতালে নার্স হিসেবে জয়েন করেছে তাই অবস্থা খারাপ হলে তুমি নিজে তাকে আনা নেওয়া কর।'

এবার ওমারের কাঁধে হাত রেখে চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল,

'হয়তো তোমার সাথে এটাই আমার শেষ দেখা। ইনশাআল্লাহ নিশ্চই আমাদের জান্নাতে দেখা হবে।'

আর একবার আলিঙ্গন করে গাড়ির দিকে চলে যায় খালিদ, ওমার তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না পিকআপটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওমার মনে মনে খালিদের জন্য প্রার্থনা করে আকাশের দিকে তাকায়।

রাতের পরিষ্কার আকাশ। ওমার জানতেও পারেনি ওই আকাশের অনেক উঁচু থেকে এতক্ষণ তাকে আর খালিদকে লক্ষ করছিল ড্রোন নামক একটা মানুষ বিহীন উড়াল যান। টার্গেট কিলিংয়ের জন্য অপরাধী শনাক্ত করতে সিআইএ এটা প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানে ব্যবহার শুরু করেছে। খালিদের পিকআপ রওনা হলে, অদৃশ্য আততায়ী ড্রোনটা তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

গভীর রাত। পাঘমানের পাহাড়ি ঢালের ঘরটাতে দুই রাকাত নামাজ শেষ করে পাশাপাশি জায়নামাজে দীর্ঘ সেজদায় প্রার্থনারত ওমার আর আসমা। দুজন মানুষ পরস্পরকে কামনা করেছিল, সেই কামনা গোপন রেখে তারা স্রষ্টার কাছে পরস্পরকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিল। সেই প্রার্থনার শক্তি দেখে তারা কৃতজ্ঞতায় সেজদায় পড়ে গেছে। সেজদা শেষে ওমার মাথা তুলে বসে। অপেক্ষা করে আসমার জন্য। কিছু সময় অপেক্ষার পর ওমার আস্তে করে ডাক দেয়—

'আসমান।'

এই প্রথম ওমার আসমার নাম ধরে ডাকল, যে নামটা সে কথাচ্ছলে নিজেই বলেছিল। কিছু নাম আছে যা সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পারে না, আসমান হলো সেই নাম যা আসমাকে আজ পরিপূর্ণভাবে ধারণ করল।

আসমা ধীরে ধীরে সেজদা থেকে মাথা তুলে ওমারের দিকে তাকাল। আসমার দুই চোখ ভেজা। কত বিষাদ ছড়িয়ে আছে তার দুই চোখে। ওর আজ বিয়ে, ওর বাবা কান্দাহারে আর ওর ভাই কুন্দুজে অসম এক মরণপণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, এখানে নিজেদের জীবনেরও নিরাপত্তা নেই, আকাশে মাঝে মাঝে চক্কর দিচ্ছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান ফাইটার, বোম্বার। এত এত আশঙ্কার ভিতরে কতটা অসহায় বোধ করছে মেয়েটি, সেটা অনুভব করে ওমারের মনটা কেঁদে ওঠে।

জায়নামাজ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দেয় আসমার দিকে, আসমা সেই বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে এই প্রথম দুজন মানব মানবী পরস্পরকে স্পর্শ করল। ভালোবাসার অপার্থিব অনুভব তাদের বুকের ভেতরে শিহরন তুলে দিল। দুই হাতে আসমাকে বুকের কাছে টেনে নিল ওমার। আলো আঁধারীর মাঝে ঝকঝকে সবুজ চোখজোড়া দূরের নক্ষত্রের মতো কাঁপছে। তার মাথা থেকে সরিয়ে দিল সবুজ চাদর। আসমার গায়ের রং দেখে ওমারের মনে পড়ল ঋগবেদে পড়েছিল আর্যরা আফগানিস্তান থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাই বুঝি আসমার গায়ে আর চোখে তার পূর্বপুরুষ আর্যদের রং। ওমারের চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না আসমা। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়। নিজের বেঁধে রাখা চুলের ফিতা ধরে টান দিলে হঠাৎ বাঁক নেওয়া পাহাড়ি ঝরনার উচ্ছাস নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চুল। গায়ের দুধ সাদা রঙের সাথে যুদ্ধ

করে না পেরে কালো চুলগুলো প্রায় সোনালি রং ছুঁইছুঁই করছে। এটা কে দাঁড়িয়ে আছে ওমারের সামনে। যেন নতুন কেউ। যেন সত্যি সত্যি আকাশ থেকে আসমান নেমে এসেছে ওমারের কাছে। গভীর মমতায় সেই আসমানকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে ওমার। এই সেই নারী, বিগত দিনগুলো যে একটু একটু করে ওমারের শরীরের ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলেছে, আর হৃদয়ের গোপন গভীরে বাংলাদেশ থেকে বয়ে এনেছিল যে ক্ষত সেটাও অলক্ষ্যে মুছে দিয়েছে। বুকের ভেতরে প্রশান্তি বয়ে যাচ্ছে, হয়তো এই প্রশান্তিটুকুর জন্য ওমার নিজেকে সারা জীবন পবিত্র রেখেছিল। আসমা দুই হাতে চেপে ধরেছে ওমারের পিঠ। তার চুলের মধ্যে ডুবে আছে ওমারের নাক, গভীর শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নেয় তার চুলের গন্ধ। ডান হাত দিয়ে আসমার কানের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে ফিসফিস করে নতুন শেখা ফারসিতে বলে—'আমি কোনোদিন কবিতা লিখিনি, জীবনের প্রথম কবিতাটি আপনার জন্য লিখেছি।'

ওমারের মুখে ফারসি শুনে ঝট করে আসমা আলিঙ্গন ছেড়ে মুখোমুখি দাঁড়াল, অবাক বিস্ময়ে চকচক করছে ওর সবুজ চোখ।

'এভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি ফারসি ভুলে যাব।'

লজ্জা পেয়ে আবার ওমারকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকায় ওর বুকে।

ওমার ওর কানের কাছে ফিসফিস করে ফারসিতে আবৃত্তি করল—

'যখন আমি ঘরে থাকি
বুকে তুলে রাখি
যখন আমি বাইরে থাকি
মাথায় তুলে রাখি,
এছাড়া আর রাখব কোথায়?
হয় না সংকুলান,
আমি তোমার একলা পাখি
তুমি আসমান।'

৭ অক্টোবর ২০০১

সকাল থেকে আমেরিকা এবং ব্রিটেন তাদের 'ওয়ার অন টেরর' নামে সামরিক অভিযান শুরু করে। বোমারু বিমানগুলো কাবুল, কান্দাহার এবং জালালাবাদে তালিবান অবস্থানগুলোর উপর একের পর এক বোমাবর্ষণ করতে থাকে। তালিবানদের যেটুকু এয়ার ডিফেন্স, রাডার আর ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইল পোস্ট ছিল সেগুলো আক্রমণের প্রথম দিনই ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকান যুদ্ধ বিমান, অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গানশিপগুলো থেকে ক্রমাগত আক্রমণ চলতে থাকে। ইউএস নেভির ক্রুজার ডেস্ট্রয়ার আর ব্রিটিশ রয়াল নেভির সাবমেরিন থেকে ছুড়তে থাকে টমাহক ক্রুজ মিসাইল। বি-৫২ আর এসি-১৩০ গানশিপগুলোর কার্পেট বোম্বিংয়ে থরথর করে কাঁপছে কাবুল। জল, স্থল ও আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষন চলছে কাবুলে। সন্দেহজনক কোনো স্থাপনাই বাদ যাচ্ছে না। এমন ভয়াবহ ফায়ার পাওয়ারের বিরুদ্ধে তালিবান যোদ্ধাদের করার কিছুই নেই। ইতোমধ্যে হতাহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রচুর সাধারণ মানুষ মারা পড়ছে। এত পরিমাণ বোমাবর্ষণ চলছে যে ধোঁয়া আর ধুলার মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে কাবুলের আকাশ। প্রায় বিশ বছরের যুদ্ধবিধ্বস্ত কাবুলে যেটুকু বাকি ছিল সেটাও ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

যুদ্ধে যুদ্ধে কাবুল এতটাই অভ্যস্ত যে, আমেরিকান হামলার সতর্কবাণী কেউ খুব একটা আমলে নেয়নি। যথারীতি সবকিছুই দৈনন্দিন স্বাভাবিকের তুলনায় কম কম ছিল। সকালবেলা ওমার আসমাকে বাইকে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। কাবুলের সরকারি হাসপাতালে অপ্রতুল ডাক্তার আর নার্সের কারণে আসমাকে বিবেচনায় চাকরী দেওয়া হয়েছে, যদিও তার নার্সিং কোর্স শেষ হতে অল্প বাকি ছিল। আসমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে ওমার স্কুলে চলে গেছে। সম্ভাব্য যুদ্ধের কারণে স্কুল আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শিক্ষকরা নিয়মিত হাজিরা দিত। ঠিক সকাল ১১টায় কাবুলের প্রানকেন্দ্রের রাডার স্টেশনে প্রথম মিসাইলটা আঘাত হানে, সেটার প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে পুরো শহর। তারপর শুরু হয় একের পর এক বিমান হামলা। ততক্ষণে কাবুলবাসী বুঝে গেছে ঘটনা কোনো দিকে যাচ্ছে, সবাই যে যার মতো করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। বেশিরভাগই বেজমেন্ট বাংকার অথবা বাড়িঘর ছেড়ে পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, বোমা হামলার সাথে সাথে ওমার বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল কিন্তু অন্য টিচাররা

তাকে আটকায়। ওরা সবাই মিলে আশ্রয় নেয় স্কুলের বেসমেন্টে। স্কুলের আশেপাশে কাছাকাছি অনেকগুলো বোমা পড়েছে ফলে এলাকাটা ধুলায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ওমার ভাবছে হসপিটালে থাকার জন্য আসমা হয়তো নিরাপদ থাকবে কিন্তু পাঘমানের বাড়ির অবস্থা ভেবে অসহায় বোধ করছে। বিকেল তিনটার দিকে হঠাৎ করে সব নিশ্চুপ হয়ে যায়। আকাশেও কোনো প্লেন উড়ছে না। এই সুযোগে লোকজন বের হওয়া শুরু করেছে। ওমার প্রথমেই ছুটতে থাকে হাসপাতালের দিকে। সারা রাস্তা ধ্বংসস্তূপ পাথর লোহালক্কড় আর গর্তে ভরা। অনেক কষ্টে পথ করে বাইক চালাতে হচ্ছে। ঘন ধুলার কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাসপাতালে পৌঁছে হামলার ভয়াবহতা আঁচ করতে পারে ওমার। আহত নারী শিশু আর মানুষের আহাজারী, অনেক মৃত দেহ পড়ে আছে হাসপাতালের করিডোরের মেঝেতে। সেসব ডিঙিয়ে পৌঁছাল আসমার ওয়ার্ডে। ওমারকে দেখে আসমা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

ওমার বলে, 'এখন কাঁদার সময় নয়, আমাদের এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে।'

আসমা অসহায়ের মতো তার ওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে, এই মুহূর্তে তাকে এখানে অনেক বেশি প্রয়োজন। ওমার তাকে আর বেশি ভাবার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে হাসপাতাল থেকে বের করে আনে। এক ভয়ঙ্কর অনুমান ওমারের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব তাকে পাঘমানের বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। আল্লাহর কাছে বারবার মিনতি করছে আল্লাহ যেন তার চিন্তাটাকে ভুল প্রমাণ করে দেন। ওমার খবর পেয়েছে অনেক তালিবান নেতাদের বাড়ি মিসাইল মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খালিদের বাবা মোল্লা ওমরের খুব কাছের মানুষ, তাকে অনেকে চেনে কিন্তু সেই চেনাটা কতদূর গড়িয়েছে সেটা একটু পর বোঝা যাবে। আসমাকে বাইকের পেছনে নিয়ে ছুটছে ওমার। ভয় আর অজানা আশঙ্কায় আসমা ওমারের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। পাঘমানের পথে যেতে যেতে শুনতে পেল দূরে কোথাও বিমান আক্রমণের সতর্ক সংকেত সাইরেন বাজছে, তার মানে আবার বিমান হামলা শুরু হতে যাচ্ছে।

পাঘমানের আদমখেল মুসা কালা গ্রামের পাহাড়ের ঢালে আসমাদের একটা বাড়ি ছিল, এটা ওদের দুজনের কারো বিশ্বাস হচ্ছে না। একটা বিশাল গর্ত হাঁ হয়ে আছে সেখানে, ওমার যা বোঝার বুঝে গেছে। আসমা পাগলের মতো ছুটাছুটি করছে, ওমার পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঝোপের গোড়ায় আসমার কোনো এক ছোট ভাইয়ের ছেড়া হাত পড়ে আছে। সেটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে করতে মাটিতে বসে পড়ে, তারপর নিস্তেজ হয়ে একপাশে হেলে পড়ে। ওমার দৌড়ে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আসমা জ্ঞান হারিয়েছে। ওমার

কয়েকবার ডাক দেয় আসমাকে, কোনো সাড়া নেই। আসমাকে একপাশে শুইয়ে রেখে, ওমার সাহায্যের জন্য আশেপাশে তাকায়, কোথাও কেউ নেই। সাহায্য পাওয়ার কোনো আশা নেই। কী ভয়াবহ বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওমার। বোমা মেরে একটা পুরো পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। একটা শিশুর হাত ছাড়া আর কোনো কিছুর কোনো চিহ্ন নেই।

নতুন করে আবার বিমান হামলা শুরু হয়েছে। এখানে আবারও হামলা হতে পারে। ঢাল থেকে কাবুলের দিকে তাকিয়ে ওমারের বুক কেঁপে উঠল, যতদূর চোখ যায় শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়ার কুন্ডলী। সারা আকাশ জুড়ে ফাইটার আর বি-৫২ বোম্বার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যেভাবে হোক আসমার জ্ঞান ফেরাতে হবে। পাহাড়ের ঢালের নিচে রাস্তার পাশে একটা নালা আছে, সেচের পানি সরবরাহ করে সেই নালা। ওমার ছুটল সেখান থেকে পানি আনতে, কিন্তু পানি নেওয়ার মতো কোনো পাত্র নেই। নিজের গায়ের চাদরটা ভালোমতো সেই পানিতে চুবিয়ে নিল, এখন চিপলে বেশ কিছুটা পানি পাওয়া যাবে, ওমার সেটা নিয়ে ওপরে উঠে এসে বসল আসমার পাশে। চাদর চিপে আসমার মুখের উপর পানি ফেলতেই সে সাড়া দিল। এবার ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করল, প্রায় আধাঘণ্টা পর আসমা চোখ মেলে তাকাল।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওমারের দিকে।

ওমার বলল—

'যেটা ঘটেছে, সেটাকে আমরা কোনোভাবেই বদলাতে পারব না, আমাদেরকে এক্ষুনি এখান থেকে বের হতে হবে। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, কাবুলে এই মুহূর্তে যদি কোনো নিরাপদ জায়গা থাকে তবে সেটা আপনার হাসপাতাল। আমরা এখন সেখানে যাব। আপনি কষ্ট করে শুধু আমাকে ধরে বাইকে বসে থাকেন।'

বলেই ওমার আসমাকে টেনে তুলে তার এক হাত নিজের কাঁধে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামা শুরু করল। বাইকের কাছে পৌঁছে পেছনের দিকে তাকিয়ে আবার হাহাকার করে উঠল আসমা। খুব নিচ দিয়ে একটা অ্যাপাচি হেলিকপ্টার উড়ে আসছে তাদের দিকে, সেটা দেখে দ্রুত একটা বড় পাথরের আড়ালে ওরা বসে পড়ল। এর মধ্যে আসমা আরও কিছুটা সামলে উঠেছে। হেলিকপ্টারটা তাদেরকে অতিক্রম করে পাশের গ্রামের কোনো টার্গেট লক্ষ করে গুলি ছুড়ল। ওমার আসমাকে আড়াল থেকে টেনে তুলে বাইকের কাছে গিয়ে কোনো করমে বাইক স্টার্ট দিল। টলতে টলতে আসমা উঠে বসল বাইকে। ওমারকে জড়িয়ে ধরল, এ ধরাটা অন্য রকম, অসহায় মানুষ তার শেষ অবলম্বনকে যেভাবে আকড়ে ধরে, তেমন।

হাসপাতালে ভিড় আর মানুষের আহাজারি আরও বেড়েছে, করিডোরে আরও দীর্ঘ হয়েছে লাশের সারি। সেসব ডিঙিয়ে আসমার ওয়ার্ডে পৌঁছে পেয়ে গেল তার ওয়ার্ড ইনচার্জকে, মধ্যবয়স্ক মহিলা আসমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল, ওমার দ্রুত তাকে সব ব্যাখ্যা করল। সব শুনে মহিলা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে, ওমার তাকে একটু আড়ালে নিয়ে বলল—

'কাবুলে এই মুহূর্তে হাসপাতাল ছাড়া আর কোনো নিরাপদ জায়গা নেই। আমি আসমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। ওর আশ্রয় আর আহতদের সেবা করা দুটোই হবে। ওর আর কোনো থাকার জায়গা নেই। ওর বাবা আর ভাইয়ের পরিচয়ের জন্য কাবুলে ওকে কেউ আশ্রয় দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে না।'

মহিলা সব বুঝল, আর ওমারকে চিন্তা করতে নিষেধ করে দিল। ওমার মহিলাকে বলল,

'খুব তাড়াতাড়ি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

মহিলা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কাজে চলে গেল, ওমারের মিথ্যে সান্তনাকে মহিলা পাত্তা দিল না।

হাসপাতালে নিজের ওয়ার্ডের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত আসমা বসে আছে। নীরবে তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। আসমার পরিবারটা ওমারের নিজের পরিবার, খালিদ যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল এখন এই পরিবারের অভিভাবক সে। এই পরিবারের জন্য কিছুই সে করতে পারল না। ছোট ছোট ফুলের মতো ভাইবোনগুলো, দুই স্নেহময়ী মুত্তাকী মা যাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটত জায়নামাজে, বাড়িটা যেন ছিল পৃথিবীর বুকে এক টুকরা জান্নাত। আসমার সেবা আর পূর্বমুখি নৈসর্গিক দৃশ্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা সময়গুলো ছিল ওমারের জীবনে পাওয়া আল্লাহর নেয়ামত। মুহূর্তের মধ্যে সব কোথায় মিলিয়ে গেল। ওমারের ভিতরে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে প্রতিশোধের আগুন। ওমার আসমার কাছে গিয়ে বসতেই আসমা ওমারের হাত চেপে ধরে ডুকরে ওঠে। এটি নারী ও শিশুদের জেনারেল ওয়ার্ড। চারদিকে কান্না আর শোরগোল। সেই শব্দে ঢাকা পড়ে যায় আসমার কান্না। ওমার তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে—

'শোনেন, যেকোনো সময় আমেরিকান ফোর্স আর নর্দান অ্যালায়েন্স মিলে কাবুল দখল করে নেবে। আমার বিশ্বাস আপনি এখানে নিরাপদ থাকবেন, কিন্তু আমার জন্য কাবুল নিরাপদ নয়। আর আমি এখন আমার জন্য নিরাপত্তা খুঁজছি না। আমি ফ্রন্ট লাইনে ফিরে যাব। খবর পেয়েছি তালিবানরা কাবুল ছেড়ে দিয়ে কান্দাহার রক্ষা করবে। কান্দাহার ওরা দখল করতে পারবে না, মোল্লা ওমর নিজে সেখানে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। আমি কান্দাহার গিয়ে ওখানে আপনার বাবার সাথে মিলব।

তারপর পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে আপনি কান্দাহার চলে আসবেন অথবা আমি আপনাকে নিতে আসব।'

আসমা মরিয়া হয়ে বলে—

'না, আপনি আমাকে সাথে করে নিয়ে যান। আমি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, কান্দাহারের পথ এখন মোটেই নিরাপদ না। পুরো হাইওয়ে পাহারা দিচ্ছে অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। আপনাকে নিয়ে সে পথে এখন যাওয়া আর আত্মহত্যা করা একই হবে। আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করেন, একসাথে মরার চেয়ে আমাদের আলাদাভাবে বেঁচে থাকাটা জরুরি। সবকিছু আমাদের জন্য পরীক্ষা। আমরা যা কিছু হারিয়েছি তার চেয়েও উত্তর কিছু আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন। ধৈর্য্য ধরেন। আর কোরআনের সূরা আল ইমরানের ১৪২ নম্বর আয়াতের ওপর বিশ্বাস রাখেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—

"তোমরা কি মনে কর তোমরা খুব সহজেই জান্নাত পেয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে, আর কারা সবর করেছে।"

'তাই ধৈর্য ধরেন। মুসলিম হয়ে আরেক মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে হবে বলে আমি সেই ফেতনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু যারা আজ আমাদের মা আর ছোট ছোট নিষ্পাপ ভাই-বোনদের এভাবে মিসাইল মেরে হত্যা করেছে তারা ভীনদেশি দখলদার, মুসলিম হিসেবে আমার দায়িত্ব এই দখলদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, যে ভাবে আমাদের সম্মানিত মুজাহেদ্বীনরা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আপনি এখানেই থাকবেন, এখানে থেকে রুফাইদা আল আসলামিয়া রাদিআল্লাহু ওয়া তা'য়ালা আনহার মতো অসুস্থ আর যুদ্ধাহতদের সেবা করবেন, এটাই আপনার জেহাদ, আমাদের জন্য সবটাই কল্যাণ, বেঁচে থাকলে দেখা হবে। যুদ্ধ থেমে গেলে আপনাকে আমার দেশে নিয়ে যাব, আমার বিশ্বাস, সেখানে আপনার একজন মা এখনও বেঁচে আছেন। আর যদি ফিরে না আসি তবে নিশ্চই জান্নাতে আমাদের দেখা হবে। আপনি সেই সৌভাগ্যবান পরিবারের সদস্য, যাদের সবাইকে আল্লাহ তার রাস্তায় কবুল করেছেন।'

ঠিক এ সময় হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো একটি মিসাইল। ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠেছে পুরো হাসপাতাল। শকওয়েভে ভেঙে পড়েছে জানালার কাচ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তালিবান যোদ্ধারা এন্টি এয়ারক্রাফট গান থেকে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ে এখনও তাদের প্রতিরোধ দৃশ্যমান রেখেছে। বিস্ফোরণের পর কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। ওমারের কথাগুলো আসমাকে যেন নতুন জীবন দিল। ওমারের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আসমা মনে মনে আল্লাহর প্রশংসা করল, আল্লাহ তাকে এমন এক দৃঢ় বিশ্বাসী

যুবককে স্বামী হিসেবে দিয়েছেন। ওমারের নিজেকে ধরে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আসমার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল—

'আমি সৌভাগ্যবান, আপনার মতো এমন একজন নারীকে আল্লাহ আমাকে স্ত্রী হিসেবে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চিন্তে থাকবেন, আমি আপনাকে হারাচ্ছি না, আমার জীবনে আলাদা করে কোনো জান্নাত নেই। আপনি আমি যেখানেই মিলব সেটাই জান্নাত। হোক সেটা দুনিয়া, হোক সেটা আখেরাত। আমি আপনাকে আল্লাহর হাতে আমানত হিসেবে রেখে গেলাম। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ সেই মহান আমানতদার যিনি কখনো খেয়ানত করেন না। এই কথার ওপর বিশ্বাস রাখবেন।'

একটা অপার্থিব খুশির আলো আসমার বিষাদ মাখা মুখমণ্ডল থেকে বের হলো, বলল—

'আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। কারণ আমি জানি আপনি যখন কথা বলেন, তখন ঠোঁট নয়, মুখ নয়, কথা বলে আপনার হৃদয়। আর কে না জানে হৃদয়ের কোনো মিথ্যে ভাষা নেই। আর আপনিও মনে রাখবেন, আমার জীবনেও আলাদা করে কোনো জান্নাত নেই, আমি আপনি যেখানেই মিলব সেটাই জান্নাত।'

বিয়ের ১৪ দিন পর ওমারের সাথে আসমার বিচ্ছেদ হলো। ওমার জানে কোনো পরাশক্তি যখন কোনো দেশে ঢোকে তখন সেই দেশ থেকে সহজে তারা বের হয় না। এমন দীর্ঘ অনিশ্চিত কষ্টের জীবনের মধ্যে আসমাকে নিতে চায়নি ওমার। আসমা অন্তত একটা ঠিকানায় থাকল, খোঁজার জন্য যাতে এখানে সে ফিরে আসতে পারে। আসমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সে বাইক নিয়ে রওনা হলো সেই জায়গার উদ্দেশ্যে যেখানে সে ট্রেনিং-এর জন্য প্রথম গিয়েছিল। তার এখন মেকানিককে খুঁজে বের করতে হবে। কাবুলের অনেক কিছুই তার এখন চেনা, কিন্তু এই অবস্থায় চলাচল করা অনেক কঠিন। রাত ৮টা বাজে, চারদিকে অন্ধকার আর কিছু সময় পরপর বজ্রপাতের মতো কোথাও না কোথাও আঘাত হানছে মিসাইল। ভারী মেশিনগান আর হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ছোড়া গোলার ট্রেসার অন্ধকার রাতের আকাশকে মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে। কাবুল নদীর ধারের ক্যাম্পটার লোকেশন ওমারের জানা ছিল। হাঁটতে পারার পর সে কাবুলের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। শহরটাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। কাবুল শহরের রয়েছে আলাদা একটা গন্ধ, রাস্তার কাবাবের দোকানে ঝুলানো কাঁচা মাংস কেটে মসলা মাখিয়ে সাথে সাথে আগুনে ঝলসালে যে গন্ধ বের হয় সেটা যেন প্রাচীন মধ্য এশিয়ার নগরী সমরকন্দ বোখারা আর কাবুলের গন্ধ। সেই কাবুল আজ তার প্রাচীন গন্ধ হারিয়ে বারুদের গন্ধে ভরে আছে। টানা দুই ঘণ্টা বাইক চালিয়ে মাঝখানে একবার পেট্রোল ভরে পৌঁছে গেছে সেই ক্যাম্পে। কাবুল নদীর ধারে তৈরি করা হয়েছে কিছু নতুন বাংকার, সেখানে বসানো আছে এন্টি এয়ারক্রাফট গান। কিন্তু সবাই হাত-পা ছেড়ে বসে আছে। এই ফায়ার পাওয়ারের সাথে লড়ে শক্তিক্ষয় করা বৃথা। তাই অপেক্ষা করছে কান্দাহারের নির্দেশের। কুন্দুজ আর মাজার-ই-শরিফে চলছে মরণপণ লড়াই। সেখানে তালিবানরা পিছু হটছে। আমেরিকান আর ব্রিটিশ ফাইটারগুলোর সাপোর্টে উত্তরের জোট এগিয়ে যাচ্ছে। উজবেকিস্তানের কারশি খানবাদ এয়ার বেজ থেকে চিনুক হেলিকপ্টারগুলো ইউএস আর্মির গ্রিন ব্যারেট স্পেশাল ফোর্স নামিয়েছে দাড়ি-এ-সউফ উপত্যকায়। জায়গাটা মাজার-ই-শরিফের দক্ষিণে। মাজার-ই-শরিফে বিমান হামলায় কয়েক হাজার তালিবান নিহত হয়েছে। উত্তর থেকে সব পুনঃদখল করে তারপর রাজধানী দখলের প্ল্যান বলে মনে হচ্ছে মেকানিকের কাছে। এক সপ্তাহ হলো ওমার এদের সাথে ক্যাম্পে অবস্থান করছে। তিন স্তরে যোদ্ধাদের উঠিয়ে নিয়ে কান্দাহারে শক্তি সংহত করার পরিকল্পনা করা

হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দল রওনা দেবে কান্দাহারের দিকে। ওমার যাবে সে দলে। ওমার এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, বেশি ওজন বহন করতে অসুবিধা হয় তাই মেকানিক ওমারের হাতে একটা হালকা ওজনের একে-৬৩ অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে দিল সাথে দুটি ম্যাগাজিন। কারণ রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে। বেশি ওজন হলে ওমারের হাঁটতে অসুবিধা হবে। কাবুল থেকে কান্দাহারের দূরত্ব ৩০৮ মাইল। রাইফেলটা ওমারের হাতে দিয়ে বলল, 'ছাত্র ভালো রেজাল্ট করলে শিক্ষকের বুক গর্বে ভরে ওঠে। বাগরাম যুদ্ধে তোমার বীরত্বের কথা আমি জানি, তোমাকে নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করি। আমি শুনেছি খালিদের পরিবারের কথা। আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, তাই হয়তো সেদিন তুমি আর তোমার স্ত্রী বাড়িতে ছিলে না। আল্লাহ্ খালিদ আর তার পরিবারের উপর রহম করুণ, তাদের কুরবানি কবুল করুণ।'

হঠাৎ ওমারের মনে হলো মেকানিক খালিদের জন্য এভাবে দোয়া করল কেন? যেন খালিদ শহিদ হয়েছে। তাই ওমার মেকানিককে জিজ্ঞেস করল, 'খালিদ এখন কোথায় আছে, কেমন আছে?'

মেকানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'কেন, তুমি কিছু জানো না?'

'নাহ।'

'খালিদ তো কুন্দুজ যাওয়ার পথে ২৪ সেপ্টেম্বর রাতেই শহিদ হয়ে গেছে।'

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।'

অবাক বিস্ময় নিয়ে মেকানিকের দিকে তাকাল ওমার।

বিমর্ষ কণ্ঠে বলল—

'সেই রাতে তার বোনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেকানিক বলল—

'ড্রোন নামের এক ধরনের ছোট রোবটিক প্লেন তৈরি করেছে আমেরিকানরা। রিমোট কন্ট্রোল দিয় চালায়। সেটা নিঃশব্দে ওপর থেকে টার্গেটের ছবি অথবা ভিডিও তুলতে পারে আর অনুসরণ করতে পারে। ড্রোন তথ্য পাঠায় কমান্ড সেন্টারে, সেখান থেকে ফাইটার প্লেনের পাইলট জেনে যায় টার্গেটকে কোথায় কখন হিট করতে হবে। আমরা অনুমান করছি ড্রোন অনুসরণ করেছিল খালিদকে তার বাড়ি থেকে, আর খালিদ কাবুল থেকে বের হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে মেইন হাইওয়েতে মিসাইল হামলার শিকার হয়। সম্ভবত তার বাবাকে মারার জন্য তাদের বাড়িতে হামলা হয়।'

ওমারের সেই মুহূর্তটার কথা মনে পড়ে যখন খালিদ তাকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করে চলে যায়। মনে পড়ে ছোট ছোট ভাইদের সাথে তার কার্পেটের ওপর হুটোপুটি করে খেলা দেখতে দেখতে ওমার কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছিল। ওমারের স্বস্তি লাগছে এই ভেবে যে খালিদের মৃত্যুর খবরটা আসমার কাছে অজানা থাকল।

যাত্রিবাহী লোকাল বাসে করে কাবুল থেকে কান্দাহারের দিকে রওনা দিয়েছে ওমার আর তার সাথে ২৯ জন তালিবান যোদ্ধা। এই দলের আমির এক চেচেন যোদ্ধা কমান্ডার শামিল। সৈন্যবাহী পিকআপ ট্রাক ব্যবহার বন্ধ আছে কারণ এটা ওপর থেকে সহজে শনাক্ত করা যায়। ইতোমধ্যে কয়েকটি ট্রাক অ্যাপাচি হামলার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়েছে। নিহত হয়েছে শ'খানেক তালিবান যোদ্ধা। কাবুল থেকে কান্দাহারের ৩০৮ মাই পথে পড়বে গজনি, তোরগান ভ্যালি, জিলান, শাহজয়, কালাত-ই-গিলজায় এবং জালডাক। কাবুল থেকে গজনির পথটা বেশি বিপজ্জনক। তারা বিকল্প গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাবে। তাই কাবুল পেরিয়ে মাইডান শাহ্হার থেকে তারা গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়ে। মাথার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর চক্কর দিচ্ছে অ্যাটাক হেলিকপ্টার গানশিপ। অন্ধকার রাতে, গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করে অভিজ্ঞ সাহসী ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি কান্দাহারের দিকে। আমেরিকানরা বুঝে গেছে তালিবানরা কাবুল দখলে রাখতে পারবে না তাই কৌশলগত অবস্থান হিসেবে কান্দাহারে যাতে বেশি যোদ্ধা জমায়েত না করতে পারে তাই প্রতিটি নড়াচড়ার ওপরে ওরা নজর রাখছে। কাবুল থেকে গজনির দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার সেটা ঘুরে যেতে লাগল ২০০ কিলোমিটার। গজনি পার হয়ে ওদের বাস উঠল কান্দাহার-গজনি হাইওয়েতে। গ্রাম্য রাস্তায় গাড়িতে প্রচন্ড ঝাঁকি খেতে খেতে যেতে হয়েছিল, হাইওয়েতে উঠে ভালো রাস্তা পেয়ে সবাই হাঁফছেড়ে বাঁচল। উত্তেজনা আর ঝাঁকিতে সবাই ক্লান্ত ছিল, ভালো রাস্তা পেয়ে গাড়ির মসৃণ গতি সবাইকে তন্দ্রা এনে দিল। গাড়ি বেশ গতিতে চলছে। মাথার ওপর নক্ষত্র ভরা আকাশ। পাঠান ড্রাইভার ওমার আর কমান্ডার শামিল ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে বাসটি ব্রেক করল, ব্রেকের ধাক্কায় সবাই সামনের সিটে বাড়ি খেল। হাইওয়ের ওপর মাটি থেকে ২০ হাত উঁচুতে তীব্র সার্চ লাইট জ্বালিয়ে পথরোধ করে যমদূতের মতো স্থির শূন্যে ভাসছে একটা অ্যাটাক হেলিকপ্টার এএইচ-৬৪ অ্যাপাচি। বাসের সবাই হাতে অস্ত্র নিয়ে গায়ের চাদরের নিচে ঢেকে রেখেছে। হেলিকপ্টারটি হেলেদুলে বাসের কাচের জানালায় আলো ফেলে ভেতরের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। যতটা সম্ভব সবাই নিজেদের চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। সবাই তাকিয়ে আছে কমান্ডার শামিলের দিকে। সে-ই সিদ্ধান্ত দেবে কখন কী করতে হবে। অ্যাপাচির তীব্র লাউডস্পিকার থেকে ইংরেজিতে আদেশ দিল, 'যাত্রিরা সবাই বাস থেকে রাস্তায় নেমে এসো।'

কমান্ডার শামিল চাপা স্বরে সবার কাছে জানতে চাইল

'আমরা কি আত্মসমর্পণ করব নাকি লড়াই করব।'

একজন বলল,

'আপনি যা বলবেন আমির আমরা তাই করব।'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে কমান্ডার শামিল বলল,

'আমরা লড়াই করব, মুসা, আরপিজি রেডি কর।'

অ্যাপাচি থেকে বারবার বের হতে আদেশ দিচ্ছে। প্ল্যান হলো সবার আগে ভালো মানুষের মতো মুসা নামবে, নেমে কয়েক কদম এগিয়ে চাদরের ভেতর থেকে আরপিজি বের করে সরাসরি অ্যাপাচিকে হিট করবে। মুসা হিট করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই গাড়ির দরজা-জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে সরাসরি গুলি করা শুরু করবে। অ্যাপাচি থেকে শেষবারের মতো আদেশ হলো—

'বের হয়ে এসো।'

প্ল্যান মতো মুসা নেমেই ফায়ার করল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা অ্যাপাচিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবান অ্যাপাচি পাইলট টার্গেট মিস করল না, ৩০ মিলিমিটারের চেইন গানের গুলি মুসাকে টুকরা টুকরা করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যে যেভাবে পারল দরজা-জানালা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমেই অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে অ্যাপাচিটিকে গুলি করা শুরু করল। এসব হালকা অস্ত্রের গুলি বুলেটপ্রুফ অ্যাপাচির কোনো ক্ষতি করতে পারল না। গুলি করে পুরো বাস ঝাঁঝরা করে দিল অ্যাপাচি। দুই তিনজন অন্ধকারে শস্য খেতের ভেতরে পালিয়ে গেলেও বেশিরভাগই মারা পড়ল। ইতোমধ্যে আরও একটি অ্যাপাচি এসে পড়েছে, সঙ্গে স্পেশাল ফোর্স নিয়ে চিনুক হেলিকপ্টার। শস্য খেতের মধ্যে সার্চ লাইট ফেলে আর একজনকে খুঁজে হত্যা করল। হাইওয়ের ওপর স্পেশাল ফোর্স দ্রুত নেমে বাসটি ঘেরাও করে ফেলল। বাসের ভেতরে আহত অবস্থায় চারজনকে জীবিত পাওয়া গেল। এর মধ্যে একজন ওমার।

১৩ নভেম্বর ২০০১

কাবুলের পতন হয়েছে। উত্তরের জোট রাজধানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। একে একে পতন হয় আফগানিস্তানের অন্যান্য প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো। কাবুলের উপকণ্ঠে বাগরাম এয়ারবেজ-এর পাশে তৈরি করা হয়েছে আফগানিস্তানের প্রধান মিলিটারি প্রিজন। এই কুখ্যাত জেলখানার নাম পারওয়ান ডিটেনশন ফ্যাসেলিটি। সেখানে একটা অস্থায়ী হাসপাতালে কড়া পাহারায় আহত চারজনের চিকিৎসা চলছিল, এর মধ্যে একজন ২৭ দিন পর মারা যায়। ওমারের গুলি লেগেছিল কাঁধে, কলার বোন ভেঙে দিয়ে গুলিটা বের হয়ে যায়। আমেরিকানদের চোখে এই তিনজন খুব গুরুত্বপূর্ণ বন্দি। তাই ভালো চিকিৎসা দিয়ে এদের দ্রুত সারিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। চার মাস হলো ওমার হাসপাতালের বেডে। দ্বিতীয় মাস থেকে তার হাত অথবা পা স্টেইনলেস স্টিলের শিকল দিয়ে বেডের সাথে বেঁধে রাখা হয়। হাড় জোড়া লাগা আর ক্ষত শুকিয়ে আসার সাথে সাথে কাঁধের ব্যান্ডেজটা ছোট হয়ে এসেছে। এখন বাম হাতটাকে গলার সাথে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। সেটাও রাখতে হবে আরও কিছুদিন। চার মাস সতেরো দিন পর তাকে জেলখানার সেলে নিয়ে রাখা হলো, দেওয়া হলো আলাদা কয়েদির পোশাক, কম্বল, একজোড়া স্যান্ডেল। বিমান রাখার পরিত্যাক্ত বিশাল হ্যাংগারকে মেরামত করে জেল বানানো হয়েছে। স্টিলের তার দিয়ে বানানো ছোট ছোট খাঁচার মতো সেল বানিয়ে এখানে বন্দিদের রাখা হয়। ওমারের শরীর অনেক দুর্বল আর শীর্ণ হয়ে গেছে। একটু নড়াচড়া করলেই হাঁপিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই ঘুমটা তাকে অনেক প্রশান্তি দেয়, যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায় ততক্ষণ সব ভুলে থাকা যায়। শারীরিক-মানুষিক কোনো যন্ত্রণা তখন আর কষ্ট দেয় না। এখানে বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনেক নির্যাতন করা হয়, সে সব চিৎকার ওমার তার সেল থেকে শুনতে পায়, তখন ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু আজ ঘুম ভাঙল একজন আমেরিকান সৈন্যের হাঁকডাকে। এই প্রথম এমন গভীর রাতে ওমারকে জাগানো হলো। বলল ১০ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হও। আমি দশ মিনিট পর আসব তোমাকে নিতে।

ওমার বলল—

'আমার প্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই, আমি সব সময় প্রস্তুত থাকি, চাইলে এখনই নিয়ে যেতে পার।'

ওমারের কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে সৈন্যটি চলে গেল আর ঠিক দশ মিনিট পর এসে ওমারের পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে কালো কাপড়ে তৈরি শপিং ব্যাগের মতো একটা বড় টুপি দিয়ে মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হলো। এরপর দুজন সৈন্য তাকে দুইদিক দিয়ে ধরে টানতে টানতে কোথাও নিয়ে চলল।

উজ্জ্বল আলো ভরা একটা অফিস রুমের মতো ঘরে নিয়ে ওমারের মাথার কালো টুপিটা খুলে ফেলা হলো। তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়ে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো। তার সামনে সামরিক পোশাক পরা চারজন অফিসার, একজনের হাতে একটা ফাইল। ফাইল হাতে অফিসারটি বলল—

'খুব ছোট্ট কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে, আশা করছি তুমি আমাদেরকে সহযোগিতা করবে।'

ওমার কোনো উত্তর দেয় না। তাকে নিশ্চুপ দেখে অফিসারটি বলে—

'তুমি আল-কায়দার একজন নেতৃস্থানীয় লোক। তুমি জানো ওসামা বিন লাদেন এখন কোন এলাকায় আছে, ঠিক কোথায় আছে।'

কিছুটা সময় নিয়ে ওমার উত্তর দিল—

'আমি জানি না তিনি কোথায় আছেন। আর তোমরা ভুল করছ, আমি আল-কায়দা না।'

ওমারের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে প্রশ্নকর্তা ভ্রু কুঁচকাল। বাকিরা হেসে দিল।

অন্য আরেকজন অফিসার হাসতে হাসতে বলল—

'আমরা এখন ওসামা বিন লাদেনকে এখানে ধরে এনে যদি জিজ্ঞেস করি সেও বলবে আমি আল কায়দা না। এমনকি এও বলতে পারে আমি ওসামা বিন লাদেন না, আমি ডুপ্লিকেট।'

সবাই হা হা করে হাসতে লাগল, হাসি থামলে আগের অফিসার বলল—

'শোনো, আমরা তোমার সম্পর্কে খুব ভালোমত জেনেই বলছি, তুমি আলকায়দা, আর তুমি খুব ভালোমতো জানো বিন লাদেন কোথায় আছে। তুমি আমাদেরকে সহযোগিতা কর, বিনিময়ে আমরা তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দেব।'

ওমার একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর একটু উঁচু করে বলে, 'আমি বলেছি আমি আলকায়দা না, আর আমাকে বল, কোন প্রমাণে তোমরা আমাকে আল কায়দা বলছ?'

ওরা যেন ওমারের এই প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল, বেশ খোশমেজাজে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। একজন কলিং বেল চাপল, সেন্ট্রি দরজা খুলে উঁকি দিলে, অফিসার বলল,

'তাকে আসতে বলো।'

কিছুক্ষণ পর সেখানে প্রবেশ করল একজন ইউনিফর্ম পরা অমেরিকান অফিসার, ক্লিনড্ শেভড মঙ্গোলয়েড এশিয়ান চেহারা। অফিসার একটা চেয়ার টেনে ওমারের সামনে বসল। ওমার তাকে দেখে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। কোথায় যেন দেখেছে একে। মিষ্টি মিষ্টি হেসে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল,

'আমাকে চিনতে পেরেছ ওমার?'

ওমারের স্মৃতি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চই ওমার একে চেনে, এই হাসি এই কণ্ঠ এই ইংরেজি উচ্চারণ। বিস্ময়ের ধাক্কায় গোল গোল হয়ে গেছে ওমারের চোখ। রাইওয়াইন্ডের ইজতিমায় পরিচিত হওয়া সেই লম্বা দাড়ি সুন্নতি পোশাক কপালে নামাজের দাগ, সর্বদা জিকির আজগার আর কোরআন তেলওয়াতে মশগুল, জিকিরে ফিকিরে থাকা সেই জাপানি শিমুজী।

হাঁ হয়ে যাওয়া ওমারের মুখ থেকে বের হলো—

'ও মাই গড! ইটস্ ইউ শিমুজী!'

'ইয়েস ইট্স মি। কী করব বলো, চাকরি বলে কথা।'

অফিসার চারজন হাততালি দিল, যেন তারা এতক্ষণ এক মজার মঞ্চ নাটক দেখে শেষ করল। শিমুজী ইউএস আর্মির কাউন্টার ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট। তাবলিগের ছদ্মবেশে তালিবানদের ভেতরে ঢুকে কাজ করেছে।

শিমুজী বলল,

'আমাকে সাহায্য করো ওমার, তুমি জানো বিন লাদেন কোথায় আছে। তুমি খালিদের বন্ধু ছিলে, খালিদের বাবা আব্দুল্লাহ হলেন মোল্লা ওমার আর ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠজন। মোল্লা ওমার আর বিন লাদেনের ভিতরে লিঁয়াজো করার কাজটা করত মি. আব্দুল্লাহ। তুমি এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষ, নিশ্চই তুমি জানো বিন লাদেনের খবর। প্লিজ হেল্প মি ওমার, হেল্প মি টু হেল্প ইউ।'

শিমুজীর কথা শুনতে শুনতে ওমারের ভেতরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। এই শিমুজী তার টিমে একসাথে ট্রেনিং করেছে। ওমার আহত হওয়ার পর বারবার হসপিটালে দেখতে গেছে, তখনই সে জেনেছে খালিদের বাড়িতে তার অবস্থানের কথা, বাকি খোঁজ পাওয়াটা শিমুজীর জন্য অনেক সহজ ছিল। তার দেওয়া তথ্যের উপরেই আকাশ থেকে ড্রোন তাদের পাঘমানের বাড়ির ওপর নজর রাখত। আর তার তথ্যে নিশ্চিত হয়েই সেখানে বোমা ফেলা হয়েছিল। শিমুজী বলল—

'আই এম সরি ওমার। সেদিন আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি, আমরা জেনেছিলাম সেদিন মি. আব্দুল্লাহ তার পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য এসেছিলেন। কী করব বলো, আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও ভুল হয়। এমন ভুল যেন আর না হয় তাই এখন আমাদেরকে একটু সাহায্য করো। আই প্রমিস, তুমি হেল্প করলে আমাদের দ্বারা আর কোনো ইনোসেন্ট ক্যাজুয়ালটি হবে না।'

ওমার রাগে কাঁপছে, এদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার এখন একমাত্র উপায় হলো ভুল তথ্য দিয়ে এদের বিভ্রান্ত করা। প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে ওমর বলল—

'আমি জানি বিন লাদেন কোথায় আছে, কিন্তু আমি বলব না। পারলে আমার কাছ থেকে কথা বের কর ইউ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার।'

এরপর থেকে সিআইএর টর্চার ম্যানুয়েলে বন্দির মুখ থেকে কথা বের করার জন্য যতগুলো মারাত্মক টেকনিক আছে প্রায় সবগুলো ওমারের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও তার মুখ থেকে একটা শব্দ তারা বের করতে পারেনি। একটা টেবিলের ওপর চার হাত-পা বেঁধে মুখোমণ্ডলের ওপর ভেজা কাপড় রেখে তার ওপর পানি ঢালতে থাকলে সেই ব্যক্তি পানির নিচে ডুবন্ত মানুষের মৃত্যু যাতনা অনুভব করে। সিআইএ'র এই কুখ্যাত শাস্তির নাম ওয়াটার বোর্ডিং। কেউ কেউ ওয়াটার বোর্ডিং-এর সময় মারাও যায়। ওমারকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে লাগাতার সাত দিন, অতিরিক্ত শাস্তি ওমারের স্নায়ুতন্ত্র অসার করে ফেলেছে। এখন আর ওমার কোনো শাস্তি টের পায় না। ওরা খুব যত্নের সাথে ওমারের ওপর এই শাস্তিগুলো প্রয়োগ করে, যেন সে মরে না যায়। ওমার তাদের কাছে খুব দামি বন্দি, কারণ সেই একমাত্র বন্দি যে নিজের মুখে বলেছে যে, সে জানে ওসামা বিন লাদেন কোথায় আছে। তাই আরও ভালো মতো ইন্টারোগেশনের জন্য ওমারকে কিউবা'র গুয়ানতানামো বে কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগস্ট, ২০০২

গুয়ানতানামো বে, কিউবা। কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে ক্যারিবিয় সাগরের গুয়ানতানামো উপসাগরে, কিউবার কাছ থেকে লিজ নেওয়া জমিতে, মার্কিন নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে এক ভয়ঙ্কর জেলখানা নির্মাণ করেছে আমেরিকা। নাইন ইলেভেনের কয়েক মাস পরে, অনেকটা তাড়াহুড়া করে এই জেলখানাটা বানায় তারা। মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত জবাবদিহিতা এড়াতে আমেরিকা নিজ দেশের মাটিতে এমন জেল তৈরি করেনি বলে ধারণা করা হয়। আমেরিকার চোখে যারা ভয়ঙ্কর অপরাধী এবং যারা আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদেরকে তারা 'এনিমি কমব্যাটেন্ট' হিসেবে এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করার জন্য এই স্পেশাল কারাগারটি তৈরি করেছে। সেই বিচারে ওমার নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর অপরাধীদের একজন যে আমেরিকার মোস্ট ওয়ানটেড অপরাধী ওসামা বিন লাদেনের খবর জানে কিন্তু বলছে না।

ননস্টপ ফ্লাইটে বাগরাম এয়ারবেজ থেকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে গুয়ানতানামো বে তে। বিশ জনের এই দলের সবাইকে কমলা রঙের কয়েদি পোশাক পরিয়ে পায়ের ডান্ডাবেড়ির সাথে কোমর আর হাতে চেন দিয়ে বেঁধে মাথায় কালো যমটুপি পরিয়ে মার্কিন সামরিক পরিবহন প্লেনে তোলা হচ্ছে। প্লেনের পাটাতনের হুকের সাথে পায়ের ডান্ডাবেড়ি লক করে দেওয়া হয়েছে। পুরো ভ্রমণে যেন টয়লেটে যেতে না হয় সেই জন্য সবাইকে ডায়াপার পরিয়ে দিয়েছে। খাবার পানিহীন প্রচণ্ড গরমের এই কার্গোর ভিতরটা নরকের অনুভূতি এনে দেয়। গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দির ধরন অনুযায়ী অনেকগুলো ক্যাম্প আছে। যেমন— ক্যাম্প এক্সরে, ক্যাম্প ডেল্টা, ক্যাম্প ইকো। কিন্তু এই সব ক্যাম্পগুলোর মধ্যে আর একটি ক্যাম্প আছে যেটাকে বলা হয় হাইলি সিকিউরিটি জেল। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের সেখানে রাখা হয়, সেটার নাম ক্যাম্প সেভেন। সেই ক্যাম্প সেভেনে ওমারকে রাখা হয়েছে।

এখন তার কোনো নাম নেই, আছে একটা নম্বর। তাকে ১১০ নামে ডাকা হয়। ছোট যে সেলটাতে তাকে রাখা হয়েছে সেটা কবরের চেয়ে একটু বড়। দেওয়ালের সাথে ঝুলানো একটা লোহার স্লিপিং বাঙ্ক তার ওপর একটা পাতলা কম্বল। সেলে ঢুকে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিয়েছে। নামাজের সময় কিম্বা কেবলা কোনোটাই সে বুঝতে পারে না, অনুমানের উপর ওয়াক্ত আর কেবলা নির্ধারণ করে নামাজ পড়ে নেয়। আসার পথে কার্গো প্লেনে চোখ, হাত-পা বাঁধা অজুহীন

অবস্থাতেও ওমার নামাজ ছাড়েনি। এখন তাকে নামাজের কথা ভাবতে হয় না, ওয়াক্ত হলে শরীরই তাকে মনে করিয়ে দেয়। ঠিক যেভাবে খিদা লাগলে খাবারের কথা মনে পড়ে, তেমনি। নামাজ তাকে এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে প্রশান্তি দেয়, পাঁচবার নামাজে সে অনুভব করে তার প্রভু তাকে ছেড়ে যায়নি। তাকে নীরব নির্জন বিচ্ছিন্ন সেলে রাখা হয়েছে। একাকিত্ব একটা শাস্তি। ওরা ওমারকে এই শাস্তিটা দিতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না, ওমার এই একাকিত্ব এই নির্জনতা এখন এনজয় করে। যত নির্জনতা ধ্যান তত গভীর। সেই গভীর ধ্যানের ভিতরে সে তার ইমাম কে পায়, তার মা'কে পায়, এখন আসমাকেও পায়। কেন যেন আর কেউ তার ধ্যানে আসে না। ইমাম তাকে বলেছিলেন অপবিত্র অন্তরে পবিত্র সত্তা আসে না, আবার পবিত্র অন্তরে অপবিত্র সত্তা আসে না। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে ওমার ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক দশ মিনিটের মাথায় তার সেলের দরজা খুলে সেন্ট্রি তার গায়ের ওপর এক বালতি বরফ শিতল পানি ঢেলে দেয়। ভেজা শরীর নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসে ওমার। প্রচণ্ড শিতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। সেন্ট্রি সেলের দরজা থেকে সরে দাঁড়াল, সেখানে এসে দাঁড়াল ছয় ফিটের বেশি উচ্চতার একজন মেজর। মুখে শয়তানি হাসি, নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—

'আমি মেজর এন্ড্রু, আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমাকে কথা বলানোর। যদি সব কথা বলতে চাও তবে দরজায় শব্দ করো, তোমাকে গরম কাপড় মুজা মোটা তোষক এবং তুলার লেপ দেওয়া হবে। আর কথা বলতে না চাইলে এখন ঘুমিয়ে পড়, সকালে দেখা হবে, ও হ্যাঁ, চাইলে গরম কফিও পেতে পার তুমি। গুড নাইট।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল, লাইট অফ হয়ে গেল, গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল সেল। গায়ের জামা-পায়জামা সম্পূর্ণ ভেজা. কম্বল ভেজা, সারা ফ্লোরে পানি ছোপ ছোপ করছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার এমন কাঁপুনি হচ্ছে যে লোহার বাঙ্কটা কটকট করে শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারের ভিতরে গা থেকে জামাটা খুলে ফেলে সেটা দিয়ে বাঙ্কের ওপরের পানি মুছে ভেজা কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে বলতে থাকে 'আল্লাহ ঘুম দাও, আল্লাহ ঘুম দাও, গভীর ধ্যানের ভেতরে চলে যায়। ঘুমিয়ে যায় তার জাগতিক দেহ। কাঁপুনিতে ঘড়ির কাঁটার মতো কটকট ছন্দে বাঙ্কের যে শব্দটা হচ্ছিল সেটা ধীরে ধীরে থেমে গিয়ে সেলের নির্জনতাকে পাথরে পরিণত করে দেয়।

ঠিক এক ঘণ্টা পর সিলিংয়ের ৫০০ ওয়াটের লাইটটা জ্বলে উঠে আর প্রচণ্ড শব্দে দরজা খুলে মেজর এন্ড্রু চিৎকার করে বলে-
'হেই কুকুর ছানা, ভালো ঘুম হচ্ছে তো? কোনো অসুবিধা নেই তো?'

তীব্র আলোর ধাক্কায় ওমার চোখ খুলতে পারে না। দুই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখে। মেজর তার হাতের ব্যাটন দিয়ে ক্রমাগত বাড়ি মারছে সেলের লোহার

দরজায়। সেই শব্দ এত তীক্ষ্ণ আর তীব্র যে সেটা ওমারের মগজের ভিতরে আঘাত করছে।

ওমার কিছুটা ধাতস্ত হয়ে উত্তর দিল—

'আলহামদুলিল্লাহ মেজর, খুব ভালো ঘুম হচ্ছে। থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কাইন্ড হসপিটালিটি।'

দপ করে মেজর এন্ড্রুর মুখ থেকে হাসিটা নিভে যায়। অবাক হয়ে সে ওমারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার এইসব শয়তানির জন্য প্রতিটি কয়েদি তাকে ঘৃণা করে, তাকে প্রকাশ্যে গালাগালি করে, সে গায়ের ঝাল মিটিয়ে তাদের পেটায় আর তারাও তাদের গালমন্দ চালিয়ে যায়। এত কষ্ট দেওয়ার পরও এত ভদ্র ভাষায় ধন্যবাদটা এন্ড্রুর গালে যেন এক চড় কষিয়ে দিল। বাকি রাত আর সে ওমারের সেলের কাছে আসেনি।

ওমার খুব দামি একজন বন্দি, যার কাছে ওসামা বিন লাদেনের খবর আছে, যে লাদেনকে সারা পৃথিবী হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু ওমারকে ওরা কোনোভাবেই কথা বলাতে পারছে না। আবার শাস্তির লিমিটও ক্রস করতে পারছে না, তারা এত দামি বন্দিকে এত সহজে মরতে দিতে চায় না। এটা ওমারের প্রতিশোধ। পুরা মার্কিন প্রশাসন কয়েদি নম্বর ১১০-এর কাছে অসহায়। ওমার তাদের এই অসহায়ত্বটা দেখতে চায়। তারা চাইলেও অনেক কিছু পারে না। প্রতিবার ওয়াটার বোর্ডিং-এর সময় যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ব্রেনে অক্সিজেন যাওয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় ঠিক সেই সময় ওমারের অনুভূতি শূন্য হয়ে যায়। কোনো কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করে না, তার হাত-পা ছেড়ে দেয়, ওরা মনে করে সে মরে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি তাকে সুস্থ করে তোলে। বেশিরভাগ মানুষ পুরা এক মিনিট নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে না, কিন্তু কেউ কেউ পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পারে। প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, ওমারের শারীরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেটা এরা ধরতে পারছে না। ওমারের জন্য এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাহায্য। ইমাম বলেন, 'কখন তুমি বুঝবে যে তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য আসছে। এটা তখন, যখন তুমি ধৈর্য ধরার ক্ষমতা লাভ করছ। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন নবি আলাইহি ওয়া সাল্লাম গণ। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য্য ধরেছেন তাঁরা, তাই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর সাহায্য পেয়েছেন তাঁরা। মনে রেখ, ধৈর্য ধরার ক্ষমতা আসে ইমান বা বিশ্বাস থেকে। যার বিশ্বাস যত বেশি তার ধৈর্য ধরার ক্ষমতা তত বেশি।'

এন্ড্রু বুঝে গেছে ওমারকে শারীরিক শাস্তি দিয়ে লাভ নেই। ওরা তাকে অসুস্থ মনে করে, মনে করে তার স্নায়ুতন্ত্র বরবাদ হয়ে গেছে তাই সে কোনো ব্যথা পায় না। তাই তারা তাকে মানুষিক অত্যাচার করার পরিকল্পনা করে।

এন্ড্রু একদিন একটা কোরআন শরিফ নিয়ে আসে ওমারের কাছে। বলে—

'তুমি যদি মুখ না খোল তবে এই কোরআন আমি তোমার সামনে পুড়িয়ে দেব। বলো তুমি মুখ খুলবে কি না?'

ওমার বলে—

'কোরআন কোথায়? আমি তো দেখছি এটা সুন্দর করে বাঁধাই করা কয়েক দিস্তা কাগজ মাত্র। তুমি তো শুধু মাত্র কাগজটাই পোড়াতে পারবে, কিন্তু এর ভিতরে যে শিক্ষাটা আছে সেটা কি পুড়বে? তুমি নিশ্চিত থাকো আমার সামনে তুমি কোরআন পোড়ালে আমি বিন্দুমাত্রও কষ্ট পাব না। আমি আফগানিস্তানে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিতে গিয়েছিলাম কি এই কয়েক দিস্তা কাগজের জন্য? আমাকে কি তোমার এত বোকা মনে হয়?'

এটা শুনে এন্ড্রু লা জবাব হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল,

'মেক সেন্স'।

এরপর এন্ড্রু শুয়োরের মাংসের এক প্লেট স্যান্ডউইচ ওমারের সেলে রেখে বলেছিল—

'বাঁচতে হলে এই হারাম খেয়েই বাঁচতে হবে, নইলে কথা বলতে হবে।'

টানা তিনদিন ওমার না খেয়ে সেলের মধ্যে পড়েছিল। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে হালাল খাবার দেওয়া হয়েছিল। সে খাবার খাওয়ার পর এন্ড্রু বলল—

'তোমার এই হালাল খাবারের মধ্যে শুকরের তেল ছিল।'

ওমার বলল—

'প্রিয় এন্ড্রু, তুমি যখন আমাকে হারাম খাবার দিয়ে সেটা খেতে বলেছিলে, আমি তখন তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোমার সত্যবাদীতায় বিশ্বাস করেছিলাম বলেই আমি হারাম খাবারটা খাইনি। আবার তুমি যখন হালাল বলে আমাকে এই খাবারটা খাওয়ালে, তখনো আমি তোমাকে বিশ্বাস করে খেলাম। ওটা আমার জন্য হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি নিজের কথা ভাবো তো একবার। একটা মানুষ তোমাকে সম্মান করে বিশ্বাস করেছিল, যার যোগ্য আসলে তুমি ছিলে না।'

এইভাবেই মেজর এন্ড্রুর সাথে দিনের পর দিন ওমারের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছিল। গুয়ানতানামো জেলের অন্যান্য ক্যাম্পের বন্দিরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেলেও, ক্যাম্প সেভেনের ভয়ঙ্কর আল কায়দা সন্ত্রাসী ওমারের ভাগ্যে তার ছিটে ফোঁটাও মেলেনি। ক্যাম্প সেভেনের ইন-চার্জ মেজর এন্ড্রু বদলি হয়ে যায় ২০০৪ এর জুন মাসে। সেই সময় পর্যন্ত একদিনও পৃথিবীর আলো এবং আকাশ দেখতে পায়নি ওমার।

ডিসেম্বর, ২০০৫

তোরাবোরা পাহাড়ের যুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনকে ধরার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ২০০৪ পর্যন্ত তার কোনো খবর কেউ পায়নি। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়েও তারা বিন লাদেনকে খুঁজে পায়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে ভিডিও টেপের মাধ্যমে ম্যাসেজ দিয়ে জানান দিয়েছে। যেটা কাতারের আল জাজিরা নিউজ নেটওয়ার্ক প্রচার করে সারা দুনিয়ায় হইচই ফেলে দেয়। এতদিন পর্যন্ত নাইন ইলেভেনের মাস্টার মাইন্ড ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে এটা আমেরিকানরা মেনে নিতে পারছে না।

দীর্ঘদিন এক লক্ষ্যে কাজ করার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের বোঝাপড়া কাজে লাগিয়ে তথ্য বের করার জন্য কাউন্টার ইন্টেলিজেন্ট স্পেশাল এজেন্ট মেজর আকিহিকো ওরফে শিমুজীকে গুয়ানতানামো বে তে পাঠানো হয়।

ইন্টারোগেশন সেল-এ ওমার আর শিমুজী মুখোমুখি। রুমের মধ্যে শুধুমাত্র ওরা দুজন। ইন্টারোগেশনে সব সময় ওমারের হাতে হ্যান্ডকাফ পরা থাকে কিন্তু শিমুজী সেটা খুলে দিয়েছে। দুই কাপ কপি এনে ওমারের দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়েছে। ওমার কাপটা স্পর্শ করে না

শিমুজী নিজের কফিতে চুমুক দিয়ে বলে—

'আমি তোমাকে পুরোটা সময় ফলো করেছি। বাগরাম থেকে গুয়ানতানামো পর্যন্ত প্রতিদিন তোমার আপডেট রেখেছি। একমাত্র আমি জানি তোমার কাছে ওসামা বিন লাদেনের কোনো খবরই নেই। তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমাদেরকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছ। তুমি জিতে গেছ ওমার। আমার প্রতি ঘৃণা রেখ না। আমি তোমার কাছে এসেছি এটা আমার জবের চেয়েও বেশি কিছু। তালিবানদের রিং এর মধ্যে ঢুকতে আমাকে দীর্ঘদিন মুসলিম সেজে মুসলমানদের মতো অভিনয় করতে হয়েছে, আর সেই অভিনয় করতে করতে কিছু বিশ্বাস আমার মধ্যেও ঢুকে গেছে। যাই হোক, আমি জানি তুমি আমার কোনো কথাই আর বিশ্বাস করবে না। সেটাই স্বাভাবিক। তোমার মনের মধ্যে কী আছে আমি জানি না। তুমি বিন লাদেন সম্পর্কে কিছু জানো না, মানলাম, কিন্তু এটা তো জানো তোমার শ্বশুর মিঃ আব্দুল্লাহ কোথায় আছে?'

খুব শান্ত কণ্ঠে ওমার বলল—

'বাগরামের যুদ্ধে আহত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর আমি আর তালিবানদের হয়ে যুদ্ধ করতে চাইনি, কেন জানো?'

'কেন?'

'কারণ, যুদ্ধটা একটা ফেতনা। এক মুসলিম ভাই তার আরেক মুসলিম ভাইকে হত্যা করছে। প্রতিপক্ষ পরস্পরকে আল্লাহু আকবর বলে গুলি করছে। আমি আমার হাতে আমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের রক্ত লাগাতে চাইনি। জেহাদ আমার কাছে ইবাদত। অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নামই জেহাদ। কোরআনে জুলুম আর জালিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর রুখে দাঁড়ানোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই জুলুম হবে সেখানেই জেহাদ হবে। এটার জন্য তোমার আলকায়দা হতে হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বিরুদ্ধে যারা লড়েছিল তারা জেহাদ করেছিল। ভিয়েতনামে আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যারা লড়েছিল তারা জেহাদ করেছিল। আফগানিস্তানে যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়েছিল তারা জেহাদ করেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের স্বপক্ষে দাঁড়ানোর নাম জেহাদ। এটাই বিশ্বজনিন মানবতা। এটা নতুন কিছু না। কিন্তু তোমার আর আমার বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা স্পষ্ট। তুমি তোমার দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার নৈতিক শক্তি রাখো না। হয় তুমি শুধুমাত্র বেতনের জন্য যুদ্ধ করো নয়তো তুমি অন্ধ, তোমার স্বজাতির অন্যায় তোমার চোখে পড়ে না। কিন্তু ইসলাম আমাকে শিক্ষা দেয়, আমি ততক্ষণ তোমার আনুগত্য করব যতক্ষণ তুমি সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। ইসলামে আনুগত্যের একমাত্র ভিত্তি হলো ইনসাফ। তুমি আমার মুসলিম ভাই হয়ে যদি জুলুম করো তবে আমার প্রতি নির্দেশ আছে তোমার হাত চেপে ধরার। আমার সেই জালিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই তখন আমার জন্য জেহাদ। তোমরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ বোঝ না। তোমরা শুধু বোঝ, ইসলাম মানে শান্তি। কিন্তু না, ইসলাম হলো অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তি।'

একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে ওমার। তাই থামে। ঘর ভর্তি নীরবতা নেমে আসে। শিমুজী মুগ্ধ হয়ে ওমারের কথাগুলো শুনছিল। সে খালিদের কথা শুনেও মুগ্ধ হতো। এরা ফ্যানাটিক আর গোঁড়াদের মতো কথা বলে না। যুক্তি দিয়ে কথা বলে। হৃদয় দিয়ে কথা বলে, বিশ্বাস হয়।

শিমুজী আবারও আগের প্রশ্নটা করে।

'তুমি জানো না মি. আব্দুল্লাহ কোথায় আছেন? তার পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তত তার কোনো না কোনো পরিকল্পনা তোমার জানা আছে।'

'দেখ, এতদিন পর এই প্রশ্ন করাটা বোকামি।'

'এটা রুটিন মানা প্রশ্ন, তোমার ওপর আমার রিপোর্ট জমা দিতে হবে।'

এবার হাসতে হাসতে বলে—

'তুমি আসলেই বিপজ্জনক লোক। বাকি জীবন তোমার জেলের ভিতরেই থাকা উচিত।'

'আমার কাছে ভেতর বাহির সবটাই জেল। গুয়ানতানামো ছোট জেল, আর এর বাইরের পৃথিবী বড় জেল। দেহ থেকে আত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মুক্তি নেই। আর জালিমের জন্য আমি অবশ্যই বিপজ্জনক ব্যক্তি। তবে আমি আল কায়দার মতো বিপজ্জনক না। আমি তাদের চিন্তাভাবনার সাথে একমত নই। আমি তাদের ব্যাখ্যা করা জেহাদ পছন্দ করি না। আমি কোনো অর্থেই নিরপরাধ মানুষ হত্যা সমর্থন করি না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ওমার, তোমার শেষ স্টেটমেন্টটা আমার খুব কাজে লাগবে।'

শিমুজী দেখা করার পর থেকে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। শিমুজী জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জনাথনকে ধরে আনা হয়েছে মাজার-ই-শরিফ থেকে। সে আছে ক্যাম্প ডেল্টা তে, কিন্তু তার সাথে দেখা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাকি অন্যদের খবর সে জানে না। আগের চেয়ে ওমারকে একটা বড় সেলে রাখা হয়েছে। সেখানে সে বাড়তি জামা, পায়জামা, গরম মুজা, ব্রাশ টুথপেস্ট, চপ্পল আর তোয়ালে পেয়েছে। নিয়মিত গোসলের সুযোগ পেয়েছে। তাকে একটা জায়নামাজ, টুপি আর একটা কোরআন শরিফ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা সে পেয়েছে সেটা হলো প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য সে বদ্ধ সেল থেকে খোলা আকাশের নিচে সময় কাটাতে পারে। তাকে দুজন সেন্ট্রি ধরে নিয়ে রেখে আসে একটা খাঁচার মধ্যে। ক্যাম্প সেভেনের সাথে লাগানো একটা বারান্দাকে লোহার তার আর তীক্ষ্ণ ধার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করে খাঁচাটা বানানো হয়েছে। ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে ওমারকে সেখানে রেখে আসে। ওমার প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। গায়ের জামা খুলে খালি গায়ে বসে থাকে রোদে। গায়ে মেখে নেয় সোনালি রোদের আদর। তার সারা গায়ে ক্ষতবিক্ষত দাগ। রোদের মধ্যে সে সব দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। বিয়ের পর আসমা সেই সব দাগগুলোর ওপর গুনে গুনে চুমু খেত আর বলত-

'আপনার চেয়ে আপনার ক্ষতগুলোকে আমি বেশি ভালোবাসি।'

ওমার নিজের সেই ক্ষতগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে খোঁজে আসমার ঠোঁটের স্পর্শ। মাথার ওপর নীল আকাশ, সেখানে উড়ছে এলবাট্রস পাখি। সেদিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে মৃদু শব্দে বলে-

'আসমান, আমার আসমান।'

এপ্রিল, ২০০৮

চিঠিটা হাতে নিয়ে স্থবির হয়ে বসে আছে ওমার। একমাস আগে তার মা মারা গেছে। ছোট্ট এক পাতার চিঠি, লিখেছে তার ছোট ভাই। গুয়ানতানামো বে'তে আসার পর তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। ২৪টি দেশের নাগরিক যারা গুয়ানতানামোতে বিনা বিচারে জেল খাটছে তাদের লিস্ট প্রকাশ করেছে আমেরিকার অ্যাসোসিয়েট প্রেস এবং দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট। সেখানে বাংলাদেশি একজনের নাম দেখে টনক নড়ে সরকারের। আনোয়ারের মাধ্যমে ওমারের পরিবার আগেই জেনেছিল সব। আফগানিস্তানে ন্যাটো জোটের ভয়াবহ হামলার খবর দেখতে দেখতে সবাই এক সময় ওমারের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু একজন ছাড়া, তিনি ওমারের মা। তিনি সরকারের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে চেষ্টা করেছেন, সরকার যেন তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। আল কায়দা সন্ত্রাসীর জন্য সরকার কোনো অনুকম্পা দেখায়নি। অনেক ক্ষেত্রে ওমারের পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। কেন ছেলেকে পরিবার থেকে সুশিক্ষা দেওয়া হয়নি। ওমারের ভাইদের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। মিডিয়া ওমারকে নিয়ে বিভিন্ন মনগড়া মুখোরোচক সংবাদ ছাপিয়েছে। সামাজিকভাবে ওমারদের পরিবার প্রায় একঘরে হয়ে গেছে। তার ভাইদের চাকুরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়েছে। বুক ভরা বেদনা হাহাকার সইতে সইতে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে ওমারের মা। ছোট ভাইয়ের এক পাতার ছোট্ট চিঠিতে রাগ অভিমান ভালোবাসা মিসিং সবকিছুই টের পেয়েছে ওমার। এ জীবন নিয়ে ওমারের কোনো অনুশোচনা নেই, নেই কারো প্রতি কোনো অভিযোগ। বিবেক এবং সত্যের পথ ধরে হেঁটেছে, আর সে পথ কতটা দুর্গম সেটা ওমার ছাড়া আর কে ভালো জানে। নির্জন সেলে ভাইয়ের চিঠিটা হাতে নিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে ওমার। দুই হাত তুলে দোয়া করে মায়ের জন্য। সে জানে অন্তত তার মা তাকে ভুল বুঝে পৃথিবী থেকে বিদায় নেননি।

রুশোর জীবনে ওমারের অভাব আর কোনো বন্ধু পূরণ করতে পারেনি। রুশোর ওপর রয়েছে ওমারের অনেক প্রভাব। সেটা রুশো ধীরে ধীরে টের পেয়েছে। ওমার চলে যাওয়ার পর তার নেশার প্রতি আসক্তিও কমে গেছে। নেশার আসক্তি যত কমেছে রুশোর কবিতা আর গান ততই রিয়েলিস্টিক হয়েছে। অ্যাবস্ট্র্যাক আর সাইক্যাডেলিক ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়েছে। ওমার তাকে সহজ ভাবে ভাবতে

বলত, কিন্তু তার কাছে মনে হতো শিল্পী মানেই জটিল কিছু। ভাবনাটা জটিল হতে পারে কিন্তু শিল্পে তার প্রকাশটা হবে সহজ। কঠিন কথাকে যে শিল্পি সহজভাবে বলতে পারে সেই সার্থক শিল্পী। ওমারের খবর জানার পর রুশো কয়েক রাত ঘুমাতে পারেনি। সবাই যে যাই বলুক রুশো জানে ওমারের দ্বারা কোনো অন্যায় করা সম্ভব না। রুশো বিশ্ব রাজনীতি বোঝে। বোঝে পুঁজিবাদী দুনিয়ার লোভ-লালসা আর প্রফিটের ভাগবাটোয়ারার রাজনীতি। টিভিতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের একটা ভাষণ দেখছিল, যেখানে বুশ গর্ব করে বলছে তারাই পৃথিবীর শান্তির দূত। পৃথিবীতে একমাত্র তারাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে। জাস্টিস জাস্টিস বলে বুশ মুখে ফেনা তুলে ফেলছে। রুশোর কাছে ব্যাপারটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো। তার মাথায় খেলে গিয়েছিল একটা গানের চিন্তা। যে গানের ভিতর দিয়ে গুয়ানতানামো বে'র কারাগারে বন্দি তার বন্ধু ওমারের জন্য সে জনমত তৈরি করছে।

জাস্টিস জাস্টিস
এটা কার কণ্ঠস্বর
ওয়ার ক্রিমিনাল
অথবা লিবারেটর!
কার আদলে কে?
নাৎসি? জায়োনিস্ট?
কারো চোখে তুমি স্বাধীনতাকামী
কারো চোখে টেরোরিস্ট।
কার আদলে কে
উত্তর দেবে বন্ধু তোমায়
গুয়ানতানামো বে।

রুশোর এই গানটি এখন দেশের সব জায়গায় বাজে। রুশোর কণ্ঠ হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী তারুণ্যের কণ্ঠ। রুশোর সহজ-সরল সাম্প্রতিক সময়ের প্রতিবাদী গানগুলো রুশোকে সময়ের আইকন রকস্টারে পরিণত করেছে। রুশো এখন দেশের জনপ্রিয় রকস্টারদের মধ্যে বিশেষ একজন। তার কনসার্টে উন্মাতাল ভক্তরা যখন তাকে গুরু গুরু বলে চিৎকার করে ডাকে, তখন সেই হাজারো তরুণদের কণ্ঠ ছাপিয়ে রুশোর কানে বাজে, ধানমন্ডি ওম্যান কমপ্লেক্সে রুশোর জীবনের প্রথম এবং ফ্লপ কনসার্ট শেষে ওমারই তাকে প্রথম ডেকেছিল— গুরু।

ওমারের জন্য যখন খুব বেশি মন খারাপ হয়, যখন খুব বেশি মনে পড়ে, রুশো তখন ধানমন্ডি মসজিদের ইমাম মাওলানা ইসহাক আব্দুর রহমানের কাছে গিয়ে চুপচাপ

কিছুক্ষণ বসে থাকে। ইমামের বয়স বেড়েছে সেই সাথে বেড়েছে শ্বাসকষ্ট। কষ্ট সত্ত্বেও তিনি নামাজের জামাত মিস করেন না। এখন তিনি আর ইমামতি করেন না, সহকারী ইমামের পেছনে নামাজ পড়েন। রুশোকে দেখলে ইমাম অনেক খুশি হন। খুশিতে তার চোখ ছলছল করে। রুশো বোঝে এই ছলছল চোখ তার বন্ধু ওমারের জন্য।

'অফিসিয়ালি আমি তোমার কাছে এসেছি ফাইনাল ইন্টারোগেশনের জন্য। বলতে পার আমার রিপোর্টের ওপর তোমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তুমি ওসামা বিন লাদেনের বিষয়ে তথ্য জানো বলে যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলে সেটা মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থার উক্তি বলে আমরা মনে করেছি। কারণ এরপর কোনোভাবেই তোমার কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও কোনো তথ্য বের করা যায়নি। তাতে সিদ্ধান্ত হলো তথ্য জানলে অবশ্যই সেটা বের হয়ে আসত। তোমার পারসোনাল বিহেবিয়ার সম্পর্কে সবাই একবাক্যে বলেছে তুমি ডিসেন্ট। তোমার চরিত্রের মধ্যে কোনো ভায়োলেন্স নেই। বিভিন্নভাবে তোমার মানসিক অবস্থা টেস্ট করা হয়েছে। যাই হোক, নাইন ইলিভেনের ঘটনায় তোমার জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে অনেকগুলো বছর তুমি বিনাবিচারে জেল খেটে ফেলেছ, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাতনা ভোগ করেছ। এই সবকিছু তোমার বিষয়ে বিবেচনায় নেওয়া হবে। আশা করছি ভালো কিছু হবে। আর এখন যা কিছু বলব সেটা আনঅফিসিয়াল এবং পারসোনাল।'

কথাগুলো বলে থামল স্পেশাল এজেন্ট মেজর আকিহিকো ওরফে শিমুজী। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে গেল। অফিসের দরজা খুলে মাথাটা একটু বের করে করিডোরটা দেখে নিল। ওমারের কাছে বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলো। শিমুজী কী যেন একটা করতে চায়। দরজা টেনে খুট করে লকটা টিপে দিল। এরপর চেয়ারটা আরও একটু বেশি করে ওমারের কাছে টেনে নিল। মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল। তারপর মাথা তুলে বলল—

'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি ওমার।'

ওমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

'আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তালিবান নেতা আব্দুল্লাহ আর তার পুত্র খালেদকে হত্যা করার। সেই জন্য আমি তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে তোমাদের ভেতরে ঢুকতে পেরেছিলাম। আমার মতো এমন বহু এজেন্ট মুসলমানের ছদ্মবেশে মুসলিমদের ভেতরে কাজ করছে। তারা দেখতে এমন আমলদার মুসলিম যে তাদের সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন আমাকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। আমি তোমাদের সাথে অভিনয় করতে করতে তোমাদের ভেতরের বিশ্বাসের সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাবলিগে দেখা সেই সৌন্দর্য আমাকে ইমপ্রেস করতে পারেনি। সেটা ঘটেছে বাগরাম আর এই গুয়ানতানামো জেলখানায়। তোমাদের

ভেতর এমন এক জাদু আছে যেটার জন্য তোমাদেরকে ভেঙে ফেলা যায় না। জিজ্ঞাসাবাদের নামে আমরা এত এত নির্যাতন করি আর তোমরা বলো— 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা।' এক অদৃশ্য আল্লাহর জন্য তোমরা দিনের পর দিন যেভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছ, এটা আমার চিন্তা জগৎকে প্রতিনিয়ত ধাক্কা দিয়েছে। মেজর অ্যান্ড্রু আমাকে বলেছে, 'তুমি যদি কোনোদিন শোনো যে আমি মুসলিম হয়ে গেছি তবে জেনো সেটার কারণ হবে কয়েদি নম্বর ১১০।

আমি খালিদ আর তার পরিবারকে হত্যা করেছি এমন এক কারণে যেটার সাথে তারা জড়িত ছিল বলে আমি এখনও কোনো প্রমাণ পাইনি।'

মাথা নিচু করে বসে থাকে শিমুজী। তার হাত কাঁপছে, ঠোঁট চেপে ধরে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওমারের মন বলছে এটা আসল শিমুজী।

'ওমার, আমি তোমার মাধ্যমে খালিদের পরিবারের কাছে ক্ষমা চাই।'

ওমার বলল—

'আমি নই, ক্ষমা করার মতো খালিদের পরিবারে একজন সম্ভবত এখনও বেঁচে থাকতে পারে।'

এরপর ওমার আসমা আর তার সাথে বিদায়ের ঘটনাটা বলল শিমুজীকে।

'জানি না সে বেঁচে আছে কি না, উত্তরের জোটের দখলে থাকা কাবুলে তার মতো তালিবান লিডারের মেয়ের পরিণতিটা কী হয়েছে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।'

একসাথে আবেগ প্রকাশের সময় দুজন মানুষ পরস্পরের আয়না হয়ে যায়। আসমার কথা ভেবে ওমার নিজেও আবেগতাড়িত হয়ে যায়। শিমুজী ওমারের হাত চেপে ধরে বলে—

'ওমার আমি মুসলিম হতে চাই। তোমার হাত ধরেই হতে চাই।'

কুখ্যাত ক্যাম্প সেভেন থেকে ওমারকে অনেক আগেই অন্য ক্যাম্পে বদলি করা হয়েছে যেখানে সে অন্য বন্দিদের সাথে মিশতে পারে আর জামাতে নামাজ পড়তে পারে। বন্দি নির্যাতনের বিষয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রকাশ পেলে আমেরিকা বেশ বেকায়দায় পড়ে। কারাগারের ভেতরে সেন্ট্রিদের সহনশীলতা বেড়েছে, সেই অনুপাতে বেড়েছে বন্দিদের সুযোগ-সুবিধা। সংবাদ মাধ্যমের আনাগোনা বাড়ার কারণে এখন মানবাধিকারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে জেল খেটে অনেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেছে। ডেপুটি জেলার সায়মন কক্স ওমারকে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ রিভিউ বোর্ডের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। এই ডাকগুলো বিনা বিচারে আটক বন্দিদের জন্য আশার আলোর মতো। কোনো বিচার ছাড়াই ওমার এক যুগ কাটিয়ে দিল এখানে। তরুণ যুবা থেকে পরিণত মানুষ। ঘাত-প্রতিঘাত কষ্টসহিষ্ণুতা আর পবিত্র জীবন ওমারের ভেতরে তৈরি করেছে অপার্থিব গাম্ভীর্য। আর তৈরি করেছে প্রভাবিত করার মতো ব্যক্তিত্ব। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। জেল প্রশাসনের সবাই তাকে বেশ সমীহ আর সম্মান করে। ভয়ঙ্কর আসামি হিসেবে তার স্ট্যাটাসের সাথে তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত।

অফিসে স্বাগত জানিয়ে বসতে বলে জেলার সায়মন। ওমারের ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে—

'আমরা তোমার দেশের সরকারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি যাতে তারা তোমাকে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু তোমার জন্য দুঃসংবাদ মাই ফ্রেন্ড। তোমার দেশের গভর্নমেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে তোমার মতো দাগি আল কায়দা সন্ত্রাসীর দায়িত্ব তারা নেবে না। এমনিতেই নাকি তারা জঙ্গি দমন করা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। তোমাকে নিয়ে নতুন করে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়াতে চায় না। সুতরাং তোমার জন্য তোমার দেশের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।'

ওমার স্থির দৃষ্টিতে সায়মনকে জিজ্ঞেস করে।

'তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর আমি আল কায়দা?'

'আমি পার্সোনালি সেটা বিশ্বাস করি না। কিন্তু জঙ্গিবাদ, আল কায়দা, এসব এখন সারা পৃথিবীর হট রাজনৈতিক ইস্যু। আমার দেশ এই ইস্যুকে ব্যবহার

করে একভাবে, তোমার দেশ করে আরেকভাবে। রাজনীতির জন্য তোমাদের প্রয়োজন আছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু এটাই সত্যি।'

ওমার বলল—

'আমি আফগানিস্তানে ফিরে যেতে চাই। সেখানে আমার স্ত্রী আছে।'

'না, তুমি সেখানেও ফিরে যেতে পারবে না, কারণ তুমি সে দেশের নাগরিক নয়। আর তুমি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে তাদের হাতেই এখন আফগানিস্তানের ক্ষমতা। তুমি সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে ওরা তোমাকে জেলে ঢোকাবে। তোমার মানবাধিকার দেখার দায়িত্ব এখন আমাদের। আমরা এমন কোনো অথরিটির হাতে তোমাকে তুলে দেব না যেখানে তুমি নিরাপদ নয়।'

ওমারের চোখে-মুখে বিষাদ ফুটে উঠল। এই জেল থেকে বের হলে, এই পৃথিবীর কোথাও তার যাওয়ার জায়গা নেই। এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি বসে আছে ওমার।

অনেকটা কাতর কণ্ঠে বলল—

'আমার স্ত্রীর দেশ কি আমার দেশ নয়?'

'না, কারণ তোমার কাছে কোনো ডকুমেন্ট নেই। তুমি এখন দেশহীন মানুষ।'

'তাহলে আমি কোথায় যাব?'

'হ্যাঁ এটা জানানোর জন্যই তোমাকে এখানে ডেকেছি। তোমার জন্য প্রথম সুখবর হলো তুমি মুক্তি পেতে যাচ্ছ। আর খারাপ খবর হলো সেটা কবে হবে এবং তোমাকে কোথায় পাঠানো হবে সেই সিদ্ধান্ত এখনও আমরা পাইনি।'

এই দীর্ঘ জেল জীবনে এতটা হতাশ অনুভূতি আর কখনো হয়নি ওমারের। মুক্তির যে আশা আর আনন্দ মনে মনে অনুভব করছিল সেটা আজ এক নিমিষেই নাই হয়ে গেল। তার স্বপ্ন ছিল এখান থেকে মুক্তি পেলে সে প্রথমে যাবে আফগানিস্তানে, সেখানে সে আসমাকে খুঁজে বের করবে তারপর তাকে নিয়ে সে বাংলাদেশে ফিরে যাবে। কিন্তু সায়মনের সিদ্ধান্ত শুনে যেন দপ করে নিভে গেল পৃথিবীর আলো। সেলের ভিতর গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল ওমার। তার অশান্ত মন অভিযোগ করতে চায়, এটা মনে হতেই সে লজ্জিত হয়। বারবার বলে—

'আমি জানি না, তুমি জানো, তুমি জানো আমার কী প্রয়োজন। আমার বেদনা তোমাকে বোঝানোর ভাষা আমার জানা নেই, তাই তোমার শিখিয়ে দেওয়া ভাষায় তোমাকে বলি, আমার জীবন আমার মৃত্যু, ওগো বিশ্বের প্রতিপালক শুধু তোমার জন্য। তুমি আমাকে গ্রহণ কর, আর আমার মনকে প্রশান্ত কর। মাবুদ গো, আমার পরিবার নাই, দেশ নাই, বন্ধু নাই, আজ আক্ষরিক অর্থেই তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। মাবুদ গো, তুমি আমার হয়ে যাও, আর আমাকে তোমার করে নাও।

আমার আকাঙ্ক্ষারা আমার অন্তরকে অশান্ত করে দিয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর, আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দাও, তুমি শান্তি তুমি শান্তি তুমি শান্তি...'

বলতে বলতে সেজদার ভেতরেই ঘুমিয়ে পড়ে ওমার।

ঠিক তিন মাস পর—

গুয়ানতানামো বে ডিটেনশন ক্যাম্পের অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ রিভিউ বোর্ড ওমারকে আবার ডাকল। সায়মন যথারীতি স্বাগত জানিয়ে বসাল ওমারকে। ওমারের বুকটা ডিবডিব করছে। কিন্তু সে নির্বিকার।

'তুমি বাড়ি যাচ্ছ এই কথাটা বলতে পারলে আমি বেশি খুশি হতাম। কিন্তু সেটা বলতে পারছি না।'

কথাটা বলে ফাইলের দিকে মনোযোগ দেয় সায়মন। তারপর বলে—

'আমাকে বলতে হচ্ছে, তুমি মুক্তি পেতে যাচ্ছ।'

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ওমারের মুখের দিকে তাকায় সায়মন।

নির্বিকার ওমার শুধু উচ্চারণ করে—

'আলহামদুলিল্লাহ।'

'তুমি আলবেনিয়া যাচ্ছ। সেখানে রেডক্রসের শরনার্থী ক্যাম্পে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দেশহীন ব্যক্তিদের আমরা ওখানে পাঠিয়ে দেই। ওখানে তুমি তোমার নতুন জীবন শুরু করবে। আগামী পরশু দিন সকাল ১০টায় তোমার ফ্লাইট। আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা তে আমাদের সামরিক বিমান তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। সেখানে রেডক্রসের লোকজন তোমাকে রিসিভ করবে। তোমার যাত্রা শুভ হোক। বেস্ট অব লাক মাই ফ্রেন্ড।'

গুয়ানতানামো থেকে যাদের মুক্তি দেওয়া হয় তাদেরকে রাখা হয় নভেম্বর ব্লকে। এখন থেকে পরশুদিন সকাল পর্যন্ত সে নভেম্বর ব্লকে থাকবে। তার প্রতিটি অঙুলের ছাপ নেওয়া হলো, হাতের তালুর ছাপ নেওয়া হলো। পাশফেরানো অবস্থা আর সামনাসামনি অবস্থায় ছবি তোলা হলো। এরপর তাকে একটা ছোট ব্যাগ দেওয়া হলো। ব্যাগের ভেতরে তার মাপের আফগান কাবলি পোশাক আর জুতা। এটা এমন মুক্তি যে মুক্তির কোনো আনন্দ নেই। গত ১২ বছরে কাটানো প্রতিটি দিনের মতোই আজকের দিনটি। ওমারের জীবন হলো তাকদিরের ঝড়ো বাতাসের ভেতরে ওড়া একটা পাখির ছোট পালক। এলোপাথাড়ি বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় দিগ্বিদিক।

১২ বছর আগে যে গেটটি দিয়ে ওমার জেলখানায় প্রবেশ করেছিল সে গেটটি এখন নেই, নতুন একটা গেট দিয়ে সে জেলখানা থেকে বের হলো। হঠাৎ কেন যেন তার জেলখানা ছেড়ে যেতে মায়া লাগছিল। কোথায় যাবে! তার মনে হচ্ছিল এখানেই সে ভালো ছিল। তার হাতে হ্যান্ডকাপ আর পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানো, দুই পাশ থেকে দুই সেন্ট্রি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাসের দিকে।

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যেতে হবে বাসে। বাসে চড়ার আগে শেষবারের মতো গুয়ানতানামো বে'র জেলখানার দিকে ঘুরে তাকাল। ক্যাম্প ডেল্টার সাইনবোর্ডে লেখা আছে, 'Honor Bound To Defend Freedom.'

রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনটা দেখে ওমার অবাক হয়েছে, ইউএস আর্মির বিশাল একটা কার্গো প্লেন। প্লেনের ভেতরে চড়ার পর বুঝল একমাত্র প্যাসেঞ্জার সে। এবার আর প্লেনের ফ্লোরে তাকে বেঁধে রাখেনি, ক্রু বসার একটা চেয়ারের সাথে লক করে রেখেছে তাকে। পাইলট ভদ্রলোক, বলেছে কয়েক ঘণ্টা পরপর তারা দেখে যাবে, তখন চাইলে টয়লেটে যেতে পারবে। কিউবা থেকে আলবেনিয়ার দূরত্ব ৯০৯৯ কিলোমিটার। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে ১০ ঘণ্টার ননস্টপ জার্নি। অনিশ্চিত যাত্রার পুরা পথটুকু ওমার ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। তিরানা এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যান্ড করে ইঞ্জিন বন্ধ করার পর পাইলট এসে ওমারকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে। পায়ের বেড়ি আর হ্যান্ডকাপ খুলে হাতে একটি মুখ খোলা খাম ধরিয়ে দিয়েছে। ওমার খামটা খুলে দেখে সেখানে তার ট্রাভেল ডকুমেন্ট আর রেডক্রসের প্রত্যায়নপত্র। পাইলট তার দুইজন কো-পাইলটসহ ওমারকে নিয়ে বিমান থেকে নিচে নেমে এলো। সেখান থেকেই টার্মিনাল ভবনের এক্সিট টা দেখিয়ে দিয়ে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল। ওমারের মনে হলো তাদের বেশ তাড়া আছে তাই আপদ তারাতারি ভালোয় ভালোয় বিদায় হলেই যেন তারা বাঁচে।

ইমিগ্রেশন অফিসার ওমারের ডকুমেন্ট দেখে সতর্ক হয়ে উঠল, কোথাও ফোন করল, কয়েক মিনিটের মধ্যে চার পাঁচ জন আর্মড পুলিশ এসে ওমারকে ঘেরাও করে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে বসাল। ওমার ভাবছে আবার কোনো বিপদে পড়ে গেল বুঝি। এর মধ্যে একজন পুলিশ তার সিল মারা ডকুমেন্ট ফেরত দিয়ে গেল। ওমার ডকুমেন্টটা খামের মধ্যে রেখে মুখ তুলতেই চমকে গেল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শিমুজী।

ওমার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—

'তুমি এখানে?'

'আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

শিমুজীকে দেখে পুলিশরা চলে গেল, মনে হলো শিমুজী সবকিছু আগে থেকেই ম্যানেজ করে রেখেছে।

শিমুজী আমেরিকান স্পেশাল এজেন্ট মেজর, নিশ্চই তার প্রভাব থাকবে এখানে।

'তুমি জানতে আমি আসছি?'

'হ্যাঁ, তোমার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাকে নিতে কোনো রেডক্রস আসবে না, তুমি আমার মেহমান। দেখ আল্লাহ তোমাকে কীভাবে সাহায্য করেন। তুমি বাকি জীবন আমার সাথে থাকবে।'

শিমুজীর কথার মমতা হঠাৎ ওমারকে স্পর্শ করে গেল, কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে উঠল, শিমুজীকে আলিঙ্গন করল, শিমুজীও পরম মমতায় ওমারকে চেপে ধরল।

আলিঙ্গন ছেড়ে শিমুজী বলল—

'আমরা তিরানা তে দুই দিন থেকে ক্যারাবিয়ান দ্বীপ বার্বাডোস-এ চলে যাব। তোমার জন্য ওয়ার্ক পারমিট করে রেখেছি। আগামী মাসে আমি চাকরি থেকে রিজাইন দিচ্ছি। বার্বাডোজে তুমি আর আমি মিলে মাছের ব্যবসা করব। সেখানে আমার কিছু ভালো বন্ধু আছে। তুমি আর আমি মিলে সমুদ্রে মাছ ধরব। পারবে না?'

ওমার হেসে বলে—

'নিশ্চই পারব।'

'চলো আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বের হই, নিশ্চই তুমি অনেক ক্লান্ত।'

তিরানা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার মুখের লবিতে শিমুজী ওমারকে থামিয়ে বলে—

'ওমার, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, দেখো তো চিনতে পার কি না'

বলে ওমারের ঘাড়টা বা দিকে ঘুরিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময় নিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে আছে— আসমা।

ওমারের শরীর থরথর করে কাঁপছে, সে শিমুজীর দিকে ঘুরে তাকাল, বুঝল সব শিমুজির পরিকল্পনা।

শিমুজী মিটমিট করে হাসছে।

ওমার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসমার দিকে এগিয়ে গেল, আসমা যেন নড়তে ভুলে গেছে। সবুজ চোখজোড়া নক্ষত্রের মতো কাঁপছে আর কান্না লুকাতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। কাছে আসতেই পরস্পরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বাঁধ ভাঙা কান্নায় কাঁপছে আসমা। কাঁদছে ওমার। কিছু সময় পর আসমার কাঁধের ওপর থেকে দৃষ্টি নামাতেই তার চোখে পড়ল পশতুন ড্রেস পরা একটা দশ-বারো বছরের ফুটফুটে বাচ্চা অবাক বিস্ময় নিয়ে তাদের দুজনকে দেখছে। আলিঙ্গন ছেড়ে আসমা বাচ্চাটার দিকে ঘুরে তাকাল, তারপর তাকাল ওমারের দিকে, চোখ ভরা কান্না কিন্তু আসমার মুখে ফিরে এলো সেই মুখটেপা হাসি, ওমারকে বলল— 'আপনার ছেলে।'

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল ওমার। দুই হাত দিয়ে ছেলেটাকে ধরে প্রাণভরে দেখল তারপর বুকের মধ্যে চেপে ধরল, তুলতুলে বাচ্চাটা ওমারের বুকের ছাতির মধ্যে যেন হারিয়ে গেল।

আলিঙ্গন ছেড়ে বাচ্চাটাকে ফারসিতে জিজ্ঞেস করল,

'কী নাম তোমার?'

বাচ্চাটা বলল-

'ওমার।'

ওমার মিষ্টি হেসে বলল-

'না, তুমি দ্বিতীয় ওমার।'

শেষ

হৃদয় আল্লাহ্‌র ঘর

মানুষের হৃদয়টা তৈরি করা হয়েছে এই জন্য যে,

সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ থাকবেন।

সে ঘরে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কিছু ঢুকালেই শুরু হবে তোমার জাগতিক অশান্তি।

শিবলীর প্রথম বেস্টসেলার উপন্যাস- দারবিশ(২০১৭)। এর পর ধারাবাহিকভাবে বেস্টসেলার হয়- দখল (২০১৮), আসমান (২০১৯), রাখাল (২০২০), ফ্রন্টলাইন (২০২১), অন্তিম (২০২২), নূর (২০২৩)।

যদিও তার লেখা কয়েকটি গানের শিরোনাম পড়লে অনেকেই তাকে গীতিকবি হিসেবে চিনে ফেলবেন। যেমন- জেল থেকে বলছি, তুমি আমার প্রথম সকাল, আমি কষ্ট পেতে ভালোবাসি, হাসতে দেখ গাইতে দেখ, কেউ সুখী নয়, হাজার বর্ষা রাত, পলাশীর প্রান্তর, প্রিয় আকাশী । ৯০ দশক জুড়ে লিখেছেন এমন সব জনপ্রিয় প্রায় চারশো গান।

পুরো একটা জেনারেশনের দৈনন্দিন দুঃখ সুখের ডায়েরি হয়ে আছে শিবলীর গান। আধুনিক তারুন্যের ভাষাকে তিনি এঁকেছেন অত্যন্ত সহজসরল রক এন রোলের ভাষায়। সেটাই শিবলীকে বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের কিংবদন্তি গীতিকবিতে পরিণত করেছে।

তার শুরু হয়েছিল গ্রুপ থিয়েটার- নাট্যচক্রে। তারপর শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে। 'কমপ্লিট ম্যান' খ্যাত সেঞ্চুরি ফেব্রিক্সের দুর্দান্ত মডেল শিবলী ছিলেন তার সময়ের ফ্যাশন আইকন।

তিনি সফল নাট্যকার। বিটিভির যুগে তার লেখা প্রথম সাড়া জাগানো নাটক 'তোমার চোখে দেখি' এবং 'রাজকুমারী'। রাজকুমারীতে মির্জা গালিব চরিত্রে তার অনবদ্য অভিনয় এখনো অনেকের মনে থাকার কথা।

কবি শিবলীর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- 'ইচ্ছে হলে ছুঁতে পারি তোমার অভিমান (১৯৯৫)'। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—'তুমি আমার কষ্টগুলো সবুজ করে দাওনা, (২০১০)'। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ— 'মাথার উপরে যে শূন্যতা তার নাম আকাশ, বুকের ভেতর যে শূন্যতা তার নাম দীর্ঘশ্বাস (২০১৪)'। বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে তার— 'বাংলাদেশে ব্যান্ড সংগীত আন্দোলন (১৯৯৭)' নামে ব্যান্ড সংগীতের ওপর লিখিত প্রথম এবং একমাত্র গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ।
নিজের লেখা, সুর ও কম্পোজিশনে এবং নিজের কণ্ঠে গাওয়া তার প্রথম অ্যালবাম—'নিয়ম ভাঙ্গার নিয়ম(১৯৯৮)'।

শিবলীর কাহিনি সংলাপ এবং চিত্রনাট্যে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র –'পদ্ম পাতার জল(২০১৫)'।
স্বভাবজাত বোহেমিয়ান, ঘুরেছেন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার পথে প্রান্তরে।
প্রিয় বিষয়- পলেটিক্স, হিস্ট্রি, এনভায়রনমেন্ট, ধর্মতত্ব, পেইন্টিংস।

একাডেমিক পড়াশোনায়- সাহিত্যে মাস্টার্স। জন্ম- পহেলা বৈশাখের সুবহে সাদিকের সময়। জন্মেই দেখেন বাংলাদেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। তখন যুদ্ধ না বুঝলেও নব্বই দশকের স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের ভেতর দিয়েই তার বেড়ে ওঠা। শৈশব কৈশর আর তারুণ্যের শহর নাটোর। যৌবনের শহর ঢাকা এবং লন্ডন। ওমর এবং ওসমান নামের দুই সন্তানের বাবা তিনি ।

Facebook Id: www.Facebook.com/latifulislamshibli/
Official website- www.latifulislamshibli.com

কেন্দ্রবিন্দু

এজতেমা হয় সেখানে যোগ দেয় ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। সেই সময় ২৫ হাজার একটা বিরাট সংখ্যা। তখন মাওলানা ইলিয়াসের সেই আন্দোলন ইমান এবং আমল ভিত্তিক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের আন্দোলনে রূপ নেয়।'

ওমার বলে—

'তখনকার অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত আর দুর্বল বিশ্বাসী মুসলিমদের জন্য যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল সম্ভবত সেটা আর সংস্কার করা হয়নি। এই আধুনিক সময়ে দাওয়া পদ্ধতি আরও বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া দরকার। আপনার কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান লাভ না করলে আনোয়ার তার কনসেপ্ট আর বিশ্বাস দিয়ে কোনোভাবেই আমাকে কনভিন্স করতে পারত না, কিন্তু এই মানুষগুলাকে আমার ভালো লাগে। এদের আন্তরিকতা আর সরলতা আমাকে মুগ্ধ করে। মানুষের সততা আর সরলতা ছাড়া অন্য কিছু আর আমাকে মুগ্ধ করে না।'

ইমাম বলেন—

'তোমার এখন যে চোখটা তৈরি হয়েছে সেই চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখা দরকার। মানুষ বিশ্ব প্রকৃতি এদের সাথে তোমার নতুনভাবে পরিচয় ঘটা দরকার। আল্লাহতায়ালা চান মানুষ ট্রাভেল করুক। কোরআনের সূরা আনকাবুতের ২০ নম্বর আয়াতে বলা আছে "আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর আর দেখ কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন।" সূরা আল আনআমের ১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলছেন, "বলুন তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর, আর দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছিল।"

"তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনাধারা, কত শস্যক্ষেত্র ও প্রমোদ ভিলা, কত সুখের উপকরণ, সেখানে তারা খোশগল্প করত। এরপর আমি সেগুলোর মালিক করেছিলাম অন্য কোনো জাতিকে।" এটা সূরা আদ দুখানের ২৫ থেকে ২৯ নম্বর আয়াত।

তুমি যদি মানুষের পছন্দের পর্যটন কেন্দ্রগুলো লক্ষ কর দেখবে তার বেশির ভাগই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ অথবা নীরব নিস্তব্ধ মলিন প্রাসাদ অথবা জাদুঘর। সপ্তআশ্চর্য বলা হয় যে সাতটি স্থানকে, সেসব জায়গা কোরআনের আয়াতের মতোই দেখ এখন অন্য কোনো জাতির দখলে। মানুষেরা সেসব ধ্বংসস্তূপের ভেতরে খোঁজে প্রাচীন মানুষের নন্দনতত্ত্ব, অথচ সেসব ধ্বংসস্তূপের পরতে পরতে খোলা বইয়ের পাতার মতো লেখা আছে ক্ষণস্থায়ী জীবনের দর্শন আর পরিণতি। পৃথিবী ভ্রমণ করে সে সব প্রাচীন জনপদ দেখলে মানুষের যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান তাকে অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। জাতীয় রাষ্ট্রক্ষমতা যত পরাক্রান্তই হোক না কেন মহাকালের গহ্বরে একদিন সেই পরাক্রম শক্তিশালী জাতিও জাদুঘরের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হবে। এজন্য জাতীয়তাবাদী পরাক্রম দেখাতে নেই। সেটা মানুষকে অহংকারী করে, এরপর সেই অহংকারী জাতি অন্য